দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

ইসলামি জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ — পৃঃ ৪

আল-কায়দাও পৌঁছে গেল মুখ্যমন্ত্রী এবার মুখোশটা খুলুন— পৃঃ ১৪

৭৩ বর্ষ, ৭ সংখ্যা।। ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২০।। ১১ আশ্বিন - ১৪২৭। যুগাব্দ ৫১২২।। website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৭ সংখ্যা, ১১ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ
২৮ সেপ্টেম্বর - ২০২০, যুগাব্দ - ৫১২২,
Website : www.eswastika.com

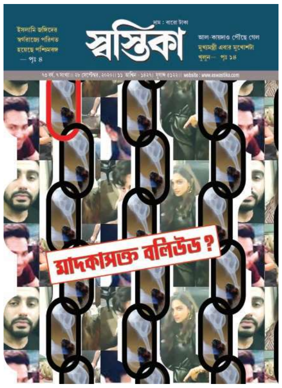

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :
সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)
সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫
সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪
অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১
অফিস হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৬
বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩
দাম : ১২ টাকা
বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57
দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫
E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রিট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▪ ৩
ইসলামিক জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ
▪ রামানুজ গোস্বামী ▪ ৪
দেশের জনমতকে প্রভাবিত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে বলিউডকে ▪ অভিমন্যু গুহ ▪ ৬
কঙ্গনা রানাউত : রুপোলি পর্দার ঝাঁসির রানি
▪ দেবযানী ভট্টাচার্য ▪ ৯
কৃষি বিলের মাধ্যমে আনা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীগুলি রাজনীতি করে নষ্ট করা অনুচিত ▪ হরদীপ সিংহ পুরী ▪ ১২
আল-কায়দাও পৌঁছে গেল : মুখ্যমন্ত্রী এবার মুখোশটা খুলুন
▪ সুজিত রায় ▪ ১৪
পশ্চিমবঙ্গ আজ জেহাদিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত
▪ মণীন্দ্রনাথ সাহা ▪ ১৭
ভারতের সাধারণ মানুষ ও নরেন্দ্র মোদী ▪ ড. সুজিত রায় ▪ ১৮
বিনীতার জন্যই পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত মেয়েদেরও সমানাধিকার ▪ ধর্মানন্দ দেব ▪ ২০
ভারতের রহস্যময়, অজ্ঞাত ও বিশিষ্ট সীমান্ত শক্তি এস এফ এফের বীরগাথা ▪ ডা. আর এন দাস ▪ ২২
গুজরাটের প্যাটেল ও কলকাতার কার্নিভাল
▪ কুণাল চট্টোপাধ্যায় ▪ ২৫
ধর্মনির্ভর আর্থিক উৎকর্ষতা এবং ধর্মকেন্দ্রিক আর্থিক ভারসাম্য
▪ সুজন পাণ্ডা ▪ ২৭
ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ : ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা
▪ ইন্দুমতী কাটদরে ▪ ৩০
কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে ▪ ৩২
সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির আধুনিক রূপকার বিদ্যাসাগর
▪ ড. তরুণকান্তি চক্রবর্তী ▪ ৩৫
গুরু গ্রন্থসাহেব : একটি পর্যালোচনা ▪ রুদ্রপ্রসাদ ▪ ৩৮
কৃষিকাজে আত্মনির্ভরতার দু-চার কথা
▪ ড. কল্যাণ চক্রবর্তী ▪ ৪০
চিঠিপত্র ▪ দেবাদিত্য চক্রবর্তী ▪ ৪৩
ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাতৃশক্তি মাতঙ্গিনী হাজরা
▪ অস্মিতা চক্রবর্তী ▪ ৪৫
গল্প : মাতৃশক্তি ▪ মিতালী মুখার্জী ▪ ৪৭

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

পশ্চিমবঙ্গ কি কাশ্মীর হইবে?

পশ্চিমবঙ্গ কি কাশ্মীরে পরিণত হইবে? সম্প্রতি মুর্শিদাবাদ জেলায় ছয়জন আল-কায়েদা জঙ্গি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হাতে আটক হইবার পর এই রকম আশঙ্কার মেঘ অনেকের মনেই ঘনাইয়া আসিয়াছে। ছয় আল-কায়েদা জঙ্গির কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের জালে ধরা পড়িবার বিষয়টি লঘু করিয়া দেখিবার কোনো কারণ নাই। এটি একটি হিমশৈলের চূড়া মাত্র। অন্তরালে যে আরও কত বিপজ্জনক কাণ্ড ঘটিতেছে— তাহা এখনো আমাদের অজানা। পশ্চিমবঙ্গ যে জঙ্গি এবং সন্ত্রাসবাদীদের আঁতুড়ঘরে পরিণত হইয়াছে, জঙ্গি সন্ত্রাসবাদীদের নিশ্চিন্তে নিরুপদ্রবে আত্মগোপন করিয়া থাকিবার অন্যতম স্থান হইয়াছে—তাহা বোঝা গিয়াছিল খাগড়াগড়ে বিস্ফোরণ কাণ্ডের ভিতর দিয়া। খাগড়াগড় কাণ্ডের বহু পূর্বেই এই অভিযোগ উঠিতেছিল যে, বাংলাদেশ হইতে জঙ্গি ও জেহাদিরা আসিয়া পশ্চিমবঙ্গে ঘাঁটি গাড়িতেছে। খাগড়াগড় কাণ্ড চোখে আঙুল দিয়া দেখাইয়া দিয়াছিল যে, জঙ্গিরা তাহাদের জাল কতদূর অবধি বিস্তার করিয়াছে এবং এই দেশের বুকে আঘাত হানিবার জন্য তাহারা কীভাবে প্রস্তুত হইতেছে। গত বৎসর ডিসেম্বর মাসে মুর্শিদাবাদ জেলায় নাগরিকত্ব বিরোধী আন্দোলনে সরকারি সম্পত্তি ধ্বংসে এই জঙ্গি জেহাদিদের ভালো রকম উপস্থিতি অনুভব করা গিয়াছিল। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত মুর্শিদাবাদ জেলাটি যে জঙ্গি জেহাদিদের আস্তানা হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার প্রমাণ পূর্বে বহুবার মিলিয়াছে। মুর্শিদাবাদ ও তৎসংলগ্ন এলাকা হইতে জঙ্গি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত বহু ব্যক্তিকে ইতিপূর্বে পুলিশ ও গোয়েন্দারা আটক করিয়াছে। কিন্তু দুঃখের ও পরিতাপের বিষয় এই যে, এই রাজ্যে জঙ্গি এবং জেহাদিরা ক্রমশ জাল বিস্তার করিলেও, রাজ্য প্রশাসনের পক্ষ হইতে ততটা সতর্কতা এবং কঠোর মনোভাব পরিলক্ষিত হয় নাই। বরং অনেক ক্ষেত্রেই রাজ্য সরকারের শৈথিল্য, গাফিলতি ও ঔদাসীন্য নজরে আসিয়াছে। এইবারও আল কায়েদার ঘনিষ্ঠ জঙ্গিরা কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হস্তে ধরা পড়িবার পর, রাজ্য প্রাশাসন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের প্রতি সহায়তার হস্ত প্রসারিত করিবার পরিবর্তে প্রশ্ন তুলিয়াছে, নবান্নকে না জানাইয়া কেন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জঙ্গিদের বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালাইল? রাজ্য প্রশাসনের এই মনোভাবই জঙ্গি জেহাদি গোষ্ঠীগুলিকে এই রাজ্যে জাল বিস্তার করিতে পরোক্ষভাবে উৎসাহিত করিয়াছে। বহু ক্ষেত্রে, এমনও দেখা গিয়াছে যে, রাজ্যের শাসক দলের কিছু নেতা নিতান্তই অর্থের লোভে এইসব জঙ্গি জেহাদি কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের সাহায্য করিতেছে।

রাজ্যের শাসক দলের এই আচরণের কারণটি আর কিছুই নয়। নিতান্তই ভোটের স্বার্থে যুক্তিহীন মুসলমান তোষণের রাজনীতি করিতে গিয়া তাহারা এই জঙ্গি জেহাদি কার্যকলাপকেও পরোক্ষে মদত দিতেছে। কিন্তু তাহারা বুঝিতেছে না, তাহাদের এই তোষণের রাজনীতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যটিকে বারুদের স্তূপের উপর স্থাপন করিয়াছে। এই বারুদের স্তূপে বিস্ফোরণ ঘটিয়া পশ্চিমবঙ্গ যদি ভবিষ্যতে কাশ্মীরে পরিণত হয়, তাহা হইলে যে তাঁহারাও রক্ষা পাইবেন না—এই সারসত্যটি শাসকদল বুঝিতে পারিতেছে না।

সুভাষিতম্

আশা নাম মনুষ্যাণাং কাচিদাশ্চর্যশৃঙ্খলা।
যযা বদ্ধাঃ প্রধাবন্তি মুক্তাস্তিষ্ঠন্তি পঙ্গুবৎ।।

আশা নামক এক অদৃশ্য শৃঙ্খলের দ্বারা আবদ্ধ মনুষ্য জীবন আশ্চর্যভাবে প্রভাবিত হয়। যে এই বন্ধনে আবদ্ধ সে সদাই চঞ্চলভাবে ঘুরে মরে, আর যে এই বন্ধনমুক্ত সে সদাই শান্ত থাকে।

উত্তর সম্পাদকীয়

ইসলামিক জঙ্গিদের স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ

রামানুজ গোস্বামী

এই লেখাটির কোনও ভূমিকার প্রয়োজন আর আছে বলে মনে হয় না। এর কারণ এটাই যে, সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ঘটে যাওয়া একের পর এক ঘটনায় এটা বুঝতে একেবারেই অসুবিধা হয় না যে, এই রাজ্য অর্থাৎ আমাদের সকলের প্রিয় পশ্চিমবঙ্গে একেবারে নিঃসন্দেহেই মুসলমান জঙ্গিদের নিরাপদ বাসস্থানে পরিণত হয়েছে। সারা ভারত তথা সারা পৃথিবীর কাছেই এই তথ্য তথা এই খবর পৌঁছে গিয়েছে এবং আবারও একবার বাঙ্গালি হিসেবে লজ্জায় আমাদের মাথা হেঁট হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। অবশ্য এত সবের পরও পশ্চিমবঙ্গের শাসককুল এই ঘটনাকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ এবং তাদের পক্ষ থেকে বরং বিএসএফ এবং অন্যান্য কেন্দ্রীয় সংস্থার কর্তব্যে গাফিলতির বিষয়ে নানা অভিযোগ ইত্যাদি শুরু হয়েছে। কিন্তু এক্ষেত্রে একটা কথা আজ আর না বললেই নয়, তা এই যে, পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় জঙ্গি কার্যকলাপ একদিনে বেড়ে যায়নি। বারে বারে বহু নিরপেক্ষ সংবাদপত্র ও নিরপেক্ষ টিভি চ্যানেল নানাভাবে সরকারকে এই বিষয়ে সজাগ করেছিল। দেশের স্বার্থে ও মানুষের স্বার্থে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব (প্রধানত ভারতীয় জনতা পার্টি বা বিজেপি নেতৃত্ব) বারে বারে সরকারের ভ্রান্ত সংখ্যালঘু- তোষণের নীতির সমালোচনা করেছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইসব খবর বা সমালোচনার কোনও তোয়াক্কাই করেনি, বরং সংকীর্ণ ভোট-রাজনীতিতে ব্যস্ত থেকেছে। স্বয়ং রাজ্যপালও নানা সময়ে এই বিষয়ে রাজ্যকে সতর্ক করেছেন। কিন্তু তাঁকে সম্মান প্রদর্শন তো দূরের কথা, রাজ্যের শাসকদল উলটে তাঁকে নানাভাবে কটূক্তি ও অপমান করেছে। তাই আজ এই রাজ্য শুধুমাত্র জঙ্গিদের safe corridor নয়, বরং safest shelter হয়ে উঠেছে।

সম্প্রতি এনআইএ (National Investigation Agency) তল্লাশি চালিয়ে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল থেকে মোট নয় জন মুসলমান আল-কায়দা জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করেছে। এদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ জেলা থেকে ছয় জন ও কেরলের এর্নাকুলাম থেকে তিন জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এরা প্রত্যেকেই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা (কোনও বিদেশি নয়)। সুতরাং বোঝাই যায় যে, কীভাবে এইসব জঙ্গি সংগঠন ভারতে বসবাসকারী মুসলমানদের (বিশেষত মুসলমান যুবকদের) মাধ্যমে এইদেশে জঙ্গিহানা ঘটানোর উদ্যোগ নিয়েছে। এইসব জঙ্গিদের মধ্যে একজনের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট পরিহিত একটি ছবি পাওয়া গিয়েছে। আবার আর একজনের বাড়িতে একটি সুড়ঙ্গ পাওয়া গিয়েছে। আলকায়দা যে কতটা ভয়ংকর হতে পারে তা আমেরিকায় ঘটে যাওয়া ৯।১১-র হামলার মাধ্যমেই তারা বুঝিয়ে দিয়েছিল। উল্লেখ্য যে, এইসব জঙ্গিরা পাকিস্তানের আল-কায়দার সঙ্গে যুক্ত ছিল এবং অস্ত্র সংগ্রহ সরবরাহ, জেহাদি প্রচার, অকস্মাৎ হামলা ইত্যাদি কাজের দায়িত্ব ছিল এদের উপরে। খবরে প্রকাশ যে, ভারতের রাজধানী দিল্লি-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অকস্মাৎ হামলা চালানোর এক ভয়ংকর ছক কষেছিল এরা, যা এনআইএ গোয়েন্দারা সম্পূর্ণ ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

রাজ্য পুলিশ ও প্রশাসন যে সর্বৈব ব্যর্থ, এতে কোনও সন্দেহই নেই এবং এই বিষয়ে রাজ্যপাল যে মন্তব্য করেছেন, তা একেবারেই যথার্থ। তিনি টুইট করেছেন যে— "State has become home to illegal bomb making that has the potential to unsettle democracy. Police@ Mamata Official busy in carrying out political errands and taking on the opposition. Those at helm@ WB Police cannot escape their accountability for this alarming decline in law and order."

স্পষ্টতই বোঝা যায় যে, এই রাজ্যে সন্ত্রাসবাদীরা নিজেদের নিরাপদ মনে করছে, কারণ এই টুইট অনুযায়ী, রাজ্য প্রশাসন ও পুলিশ একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে এই জঙ্গি কার্যকলাপ বন্ধ করতে। বিশেষত, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্য প্রশাসনের দুর্বলতার কথা এখন এই রাজ্যে বহুচর্চিত বিষয় এবং বিভিন্ন বিরোধী দলনেতা-নেত্রীদের বক্তব্যেও উঠে আসছে। ২০১৪ সালে ভয়াবহ খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ড (বর্ধমান জেলা), ২০১৮ সালে বুদ্ধগয়ায় বিস্ফোরণ ও তার চক্রীর এই রাজ্যে ধরা পড়া, কয়েক মাস আগে তানিয়া পরভিন নামক এক উচ্চশিক্ষিতা ছাত্রীর উত্তর চব্বিশ পরগনার বাদুড়িয়া থেকে গ্রেপ্তার হওয়া এবং বর্তমানে এই সমস্ত আল-কায়দা জঙ্গিদের ধরা পড়া এটাই প্রমাণ করে দেয় যে, এই রাজ্য ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের শক্ত ঘাঁটিতে পরিণত হয়ে গিয়েছে। কয়েক মাস আকে নৈহাটীতে এক ভয়ংকর বোমা বিস্ফোরণ কাণ্ড ঘটে যায়, যার অভিঘাতে গঙ্গার অপর তীরবর্তী ঘরবাড়িও কেঁপে ওঠে। এই বিস্ফোরণের যে চিত্র সমস্ত টিভি চ্যানেলে তথা সমস্ত সংবাদপত্রে পাওয়া গিয়েছে, তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, অতি ভয়ংকর কোনও বোমা বিস্ফোরণই সেদিন ঘটেছিল। এর পিছনেও কোনও নাশকতামূলক কাণ্ড ছিল বলেই সন্দেহ আর যে রাজ্য বোমা তৈরির কারখানা রূপে প্রসিদ্ধ

> **ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশের স্বার্থবিরোধী ও জঙ্গিদের মদত-প্রদানকারী সংখ্যালঘু তোষণ একেবারেই চলবে না।**

হয়ে উঠেছে, সেখানে যে এমনটা ঘটবেই এটাই তো স্বাভাবিক।

নাগরিকত্ব আইন পাশ হওয়ার পরেই মুর্শিদাবাদে শুরু হয়ে যায় ভয়ানক জেহাদি কার্যকলাপ। তাছাড়া বিভিন্ন স্থানে অগ্নিসংযোগ, রেলের লাইন উপড়ে ফেলে দেওয়া, রেলের বগিতে অগ্নিসংযোগ, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি ধ্বংস করা প্রভৃতি নানাবিধ কার্যকলাপ সেই সময়ে সংঘটিত হয়েছিল। স্পষ্ট বোঝা যায় যে, রাজ্য সরকারের দ্বারা নানাভাবে সমর্থন না থাকলে এত ভয়াবহ কাণ্ড ঘটানো সাধারণ মানুষের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। রাজ্য সরকার যেহেতু সিএএ-এনআরসি বিরোধী, তাই এই সব কাণ্ড যারা ঘটিয়েছিল, সেইসব জেহাদিদের কখনই দেশবিরোধী বা রাষ্ট্রদ্রোহী বলে চিহ্নিত করেনি। কিন্তু এটা তো আজ প্রমাণিত যে, পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল আল-কায়দার ডেরায় পরিণত হয়েছে। কারণ এই দুই রাজ্য সরকারই জেহাদি মুসলমানদের সমর্থক।

অনেকে মনে করেন যে, দারিদ্র্য ও বেকারত্ব মুসলমান যুবকদের এইসব ভুল পথে নিয়ে যায়। তাই প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা। এই প্রসঙ্গে উঠে এসেছে খারিজি মাদ্রাসার কথাও; যেসব স্থানে রাষ্ট্রদ্রোহমূলক শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু একটা কথা এই ক্ষেত্রে অবশ্যই উল্লেখ করতেই হবে— তা হলো এই যে, এমন কোথাও তো শোনা যায়নি যে, অশিক্ষিত বা শিক্ষিত দরিদ্র, বেকার হিন্দু যুবকেরা নানা জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সারা পৃথিবীতে সন্ত্রাসবাদী হামলা করে বেড়াচ্ছে। এর কারণ, হিন্দুধর্ম সন্ত্রাস-শিক্ষা দেয় না। যারা বলেন যে, সব মুসলমানই জঙ্গি নয়, তাদের বোধ হয় এটা স্মরণে নেই যে, সব জঙ্গিই কিন্তু মুসলমান। তাছাড়া, এই ইসলামি সন্ত্রাস কোনওরকম দারিদ্র্য বা শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত নয়। তাই কলেজের শিক্ষিত ছাত্র, কম্পিউটার সায়েন্সের উচ্চশিক্ষিত ছাত্রও জঙ্গি দলে নাম লেখায়।

মনে রাখতে হবে যে, ওসামা বিন লাদেন নিজেও একজন উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত জঙ্গি সর্বাধিনায়কই ছিল। আসলে এটি হলো ইসলামি মৌলবাদী উগ্র মানসিকতা যা বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে আইএস, জেএমবি বা আল-কায়দার নাম ধরে উপস্থিত হয়েছে। যে সব কথাকথিত উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি এখনও ইসলামের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে নির্বিকার থাকতে চান, তাদের প্রতি করুণা জানিয়ে স্বামী বিবেকানন্দ ইসলাম বা মুসলমান ধর্ম প্রসঙ্গে কী বলেছেন, তা এই ক্ষেত্রে উদ্ধৃত করি : ''লক্ষণীয় যে, মুসলমানরা এই বিষয়ে সর্বাপেক্ষা অপরিণত ও সাম্প্রদায়িক ভাবাপন্ন। তাঁহাদের মূল মন্ত্র আল্লা এক এবং মহম্মদই একমাত্র পয়গম্বর। যাহা কিছু ইহার বহির্ভূত সে সমস্ত শুধু খারাপই নহে উপরন্তু সে সমস্তই তৎক্ষণাৎ ধ্বংস করিতে হইবে; যে কোনো পুরুষ বা নারী এই মতে সামান্য অবিশ্বাসী তাহাকেই নিমেষে হত্যা করিতে হইবে; যাহা কিছু এই উপাসনা পদ্ধতির বহির্ভূত তাহাকেই অবিলম্বে ভাঙিয়া ফেলিতে হইবে; যে কোনো গ্রন্থে অন্যরূপ মত প্রচারিত হইয়াছে সেগুলি দগ্ধ করিতে হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর হইতে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত ব্যাপক এলাকায় দীর্ঘ পাঁচশত বৎসর ধরিয়া পৃথিবীতে রক্তের বন্যা বহিয়া গিয়াছে। ইহাই মুসলমান ধর্ম।" (Complete Works, Vol. IV, P. 125-126)

স্বামীজী আরও বলেছেন যে— ''হিন্দুধর্ম কখনও অপর ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করে নাই। আমাদের দেশে সকল সম্প্রদায়ই প্রেম ও শান্তিতে বাস করিতে পারে। মুসলমানদের সঙ্গে সঙ্গেই ভারতে ধর্মসম্বন্ধীয় মতামত লইয়া হত্যা অত্যাচার প্রভৃতি প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা আসিবার পূর্ব পর্যন্ত ভারতে আধ্যাত্মিক রাজ্যে শান্তি বিরাজিত ছিল।" (বাণী ও রচনা ৯।৪৩৯)

এই প্রসঙ্গে স্বামীজীর সতর্কবাণী এই যে— ''মুসলমানগণ সর্বজনীন 'ভ্রাতৃভাব' করে, কিন্তু বাস্তবিক কাজে কতদূর দাঁড়ায়? দাঁড়ায় এই, যে মুসলমান নয়, তাহাকে আর এই ভ্রাতৃসঙ্ঘের ভিতর লওয়া হইবে না— তাহার গলা কাটা যাইবার সম্ভাবনাই অধিক।" (৩।১৫৪)

হিন্দুধর্মাবলম্বীদের প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের সতর্কবাণী এই যে— ''মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষে প্রথম আসে, তখন ভারতে এখনকার অপেক্ষা কত বেশি হিন্দুর বসবাস ছিল, আজ তাহাদের সংখ্যা কত হ্রাস পাইয়াছে। ইহার কোনো প্রতিকার না হইলে হিন্দু দিন দিন আরও কমিয়া যাইবে, শেষে আর কেহ হিন্দু থাকিবে না। অতএব ওঠ, জাগো— পৃথিবীর আধ্যাত্মিকতা রক্ষা করিবার জন্য বাহু প্রসারিত কর।" (৫।৩৪০)

যে সমস্ত হিন্দুধর্মবিদ্বেষী তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এত সবের পরেও উগ্রপন্থা ও ইসলামকে সমার্থক বলে মানতে রাজি নন, তাদের প্রতি স্বামীজী বলেছেন যে— ''জগতে যত জাতি আছে, তাহার মধ্যে হিন্দুই সর্বাপেক্ষা পরধর্মসহিষ্ণু। ভারতে মুসলমানেরাই প্রথমে পরধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে তরবারি গ্রহণ করিয়াছিল।" (৯।৪৪৭)

স্বামীজী স্পষ্ট ভাষায় এই কথাই জানিয়েছেন যে— ''বর্বর জাতির আক্রমণ-তরঙ্গ বার বার আমাদের এই জাতির মস্তকের উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। শত শত বৎসর ধরিয়া 'আল্লা হো আকবর' রবে ভারতগগন মুখরতি হইয়াছে এবং এমন হিন্দু কেহ ছিল না যে প্রতি মুহূর্তে নিজের জীবন বিনাশ আশঙ্কা না করিয়াছে।" (৫।২৭১)

তাই আজ একথা নিঃসন্দেহেই বলা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে যে ভয়ানক ইসলামিক মৌলবাদ তথা জঙ্গিবাদ ঘাঁটি গেঁড়ে বসেছে, তার মূলে রয়েছে সীমাহীন সংখালঘু তোষণ, মহামহিম রাজ্যপালের কথায় তোয়াক্কা না করা, যে কোনও বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা না করা ইত্যাদি। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া বসানোর ক্ষেত্রে জমি দেওয়ার প্রশ্নে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে কোনও ভাবেই সহায়তা করেনি। তাই আজও কয়েক হাজার কিলোমিটার বেড়া দেওয়া বাকিই হয়ে গিয়েছে। আসলে দেশের নিরাপত্তার বিষয়টি এই রাজ্যে উপেক্ষিতই রয়ে গিয়েছে। আজ একথা মনে রাখতেই হবে যে, এই রাজ্যে বর্তমান পরিস্থিতিতে যে রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবি উঠেছে, তা একেবারেই যথার্থ। ছদ্ম ধর্মনিরপেক্ষতা যে কতদূর ভয়ানক হতে পারে, বিগত কয়েক বছরে এই রাজ্যে একের পর এক ঘটনা তা আমাদের স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিচ্ছে। এর পরেও যদি ইসলামি জঙ্গি বা মুসলমান-সন্ত্রাসবাদ (যে বিষয়ে আজ পৃথিবীর সমস্ত উন্নত দেশই চিন্তিত) প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গবাসী সচেতন না হয়, তবে ভয়াবহ বিপদ তথা ভয়ংকর জঙ্গিহানা যে কোনও সময়েই ঘটে যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, নমস্তে ট্রাম্প অনুষ্ঠানে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও তাঁর বক্তব্যে এই ইসলামিক সন্ত্রাসবাদের বিষয়ে বলেছেন। জঙ্গিরা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হামলার পদ্ধতি, প্রক্রিয়া প্রভৃতি সবই বদলাচ্ছে। তাই দেশের স্বার্থে, মানুষের স্বার্থে, নিজেদের স্বার্থে সমস্ত দেশপ্রেমিক ভারতীয়দের আজ ভারত সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে ও সর্বদাই সজাগ থাকতে হবে। ভারতের প্রকৃত নাগরিক মুসলমানরা, যারা মনে-প্রাণে ভারতকে নিজেদের মাতৃভূমি বলে মনে করে, সেই সব মুসলমান নাগরিক নিশ্চয়ই ভারতে থাকবে— কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার নামে দেশের স্বার্থবিরোধী ও জঙ্গিদের মদত- প্রদানকারী সংখ্যালঘু তোষণ একেবারেই চলবে না। তাই, পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তার স্বার্থে, এখানকার সাধারণ মানুষের স্বার্থে, সর্বোপরি ভারতের স্বার্থে আজ অবিলম্বে ভারত সরকারকে পশ্চিমবঙ্গ বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে, তবেই এই রাজ্যের কল্যাণ সাধন সম্ভব। ■

দেশের জনমতকে প্রভাবিত করতে ব্যবহার করা হচ্ছে বলিউডকে

অভিমন্যু গুহ

বর্তমানে বলিউড দুই অভিনেত্রীকে নিয়ে সরগরম। একজন কঙ্গনা রানওয়াত, অপরজন রিয়া চক্রবর্তী। অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সব পেশার ক্ষেত্রেই থাকে, কিন্তু মূলধারার রাজনীতিতে বলিউড বহুদিনই চলে এসেছে নানান কৃতকর্মের দরুন। এই কৃতকর্মের মধ্যে অন্যতম অবশ্যই মাফিয়া জগতের সঙ্গে বলিউডের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সেটা অন্য প্রসঙ্গ। সুতরাং এই দুই নায়িকার ঘটনায় যে ভারতীয় রাজনীতিকে উত্তাল করবে, তাতে অবাক হবার কিছু নেই। দুটি ঘটনা সম্পর্কে সামান্য কিছু কথা আগে বলে নিই। প্রথমত, কঙ্গনা রানওয়াত দীর্ঘদিন ধরে মহারাষ্ট্রের সরকার ও পুলিশের কঠোর সমালোচক। এবং তাঁর এই গণতান্ত্রিক অধিকার সংবিধান-স্বীকৃত। যে অধিকারের বলেই এতদিন বলিউডের একাংশ নির্বিবাদে কেন্দ্রের মোদী সরকারকে বাইরের লোকের কাছে হেনস্থা করার চেষ্টা করেছে। মুশকিল হচ্ছে, এ দেশের বিরোধীরা ও তাদের জ্ঞানবুদ্ধি যারা নিয়মিত সাপ্লাই করেন, সেই বামপন্থীদের মুখে অহরহ সহিষ্ণুতার বাণী শোনা যায় এবং দেশের বিজেপি সরকার কতটা অসহিষ্ণু তা প্রমাণে মরিয়া থাকেন তাঁরা। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তারা নিজেরা যে সবচেয়ে বড়ো অসহিষ্ণু, অগণতান্ত্রিকও বটে, তার প্রমাণ দিতে চেষ্টার ত্রুটি রাখছেন না।

সুতরাং মহারাষ্ট্র সরকার যে কঙ্গনাকে ক্রমাগত শারীরিক ও মানসিকভাবে লাঞ্ছনা

করে চলেছেন এবং বামপন্থীরা সোশ্যাল মিডিয়ায় টিপ্পনী সহযোগে বিষয়টিকে যেভাবে উপস্থাপিত করছেন, কঙ্গনার ওপর তাঁদের রাগের প্রকৃত কারণ যে শুধুমাত্র তিনি বিজেপির কাজকর্মের সমর্থক বলে তা বুঝতে কারোর বাকি থাকছে না। গণতন্ত্রে কোনও রাজনৈতিক দলের সমর্থক হওয়া দোষের হতে পারে না। কিন্তু ভারতের দুর্ভাগ্য, যে দলের সরকার দেশের শাসন-ক্ষমতায়, দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটে নির্বাচিত, তাদের পক্ষে কথা বললে আপনার 'সাম্প্রদায়িক', 'ফ্যাসিস্ত' 'নাৎসি' নানা প্রকার বদনাম জুটবে। এও দুর্ভাগ্য, মহারাষ্ট্রের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত যে দলের প্রতিহিংসার শিকার হচ্ছেন

কঙ্গনা রানওয়াত নিত্যদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুলছেন আর বোমা ফাটাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ সত্য কী মিথ্যা তা প্রমাণের আগেই কমিউনিস্ট লবি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, অভিযোগের গুরুত্ব যথাসম্ভব হ্রাস করে দিতে।

করণ জোহরের এই পার্টি ঘিরেই বর্তমানে তোলপাড় বলিউড। পার্টিতে রয়েছেন অর্জুন কাপুর, মালাইকা অরোরা, রণবীর কাপুর, দীপিকা পাড়ুকোন, বরুন ধাওয়ান, ভিকি কৌশল ও শাহিদ কাপুর।

অনবরত। তারা দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুযোগ নিয়ে জনমতকে পালটে দিয়ে শাসন ক্ষমতায় আসীন এবং তাদের বহুদিনের মরিয়া চেষ্টা বলিউডকে করায়ত্ত করতে উঠে পড়ে লেগেছে।

অপরদিকে সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে সারাদেশে এক ধরনের সেন্টিমেন্ট তৈরি হয়েছিল, যে কারণে কেন্দ্রীয় সরকার উদ্যোগী হয়ে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয়। সিবিআই তদন্তের গতিপ্রকৃতি কোন দিকে যাবে, সেটা ভবিষ্যৎ সময়ই বলবে। আপাতত সিবিআই সুশান্তের বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসাবাদের সময় তার মাদক সেবনের অভিযোগ পেয়েছিল, রিয়ার সঙ্গে যে সমাজের গণ্যমান্যদের যোগাযোগ রয়েছে সেটাও স্পষ্ট। বিশেষত, মহেশ ভাটের সঙ্গে রিয়ার ঘনিষ্ঠ মুহূর্তের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় এই মুহূর্তে যথেষ্ট ঘোরাঘুরি করছে। মাদক সেবন আইনের চোখে অপরাধ ও রিয়ার মতো অভিনেত্রী যদি সেটা নিয়ে থাকেন তাহলে তার অপরাধও খণ্ডিত হয় না কোনোমতেই। স্বাভাবিকভাবেই এই অভিযোগে সিবিআই তাকে গ্রেপ্তার করতে বাধ্য হয়। এতদিন পর্যন্ত জানা ছিল বিজেপি মারাঠি-নাগপুরওয়ালাদের দল। কিন্তু গত নির্বাচনে সমীকরণ বদলায়। কংগ্রেস-এনসিপির সমর্থনে শিবসেনা ক্ষমতায় আসার পর থেকে বিজেপি এখন আর মারাঠিদের দল নয়। এদিকে নীতীশ কুমারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিজেপি বিহারের মসনদে পুনরাসীন হবার পর থেকে বিশেষত পশ্চিমবঙ্গের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছে গুটকাখোরের দল। তার ওপর অভিনেতা সুশান্তের এক জ্ঞাতি দাদা আবার বিজেপির বিধায়ক। মোটামুটি এই বামপন্থী ফর্মুলা মানলে সুশান্তের মৃত্যু অতি স্বাভাবিক, তার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়। বিজেপিওয়ালা দাদার ভাইয়ের মৃত্যুতে শোকের কোনো কারণ থাকতে পারে না। তার ওপর রিয়া বাঙ্গালি, এই আবেগে সওয়ার করারও চেষ্টা চলছে, চলতি বিচ্ছিন্নতাবাদের ট্রেন্ড মেনে। বিভাজনের রাজনীতির ভয়াবহতা ও ভয়ংকর পরিণাম এখন সামনে আসছে।

তাহলে মোদ্দাকথা বিষয়টা এই দিকে গড়াচ্ছে যে, আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কিছু বলতে পারবেন না, তাহলে আপনি বিজেপির দলীয় সমর্থক বনে যাবেন। রিয়া চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তারি নিয়ে সিবিআইয়ের পদক্ষেপ যে মোটেই ভুল ছিল না তা ক্রমশ প্রকাশ্যে আসছে। ইতিমধ্যেই দীপিকা পাড়ুকোনের নাম এসেছে মাদক কাণ্ডে। স্মরণে থাকতে পারে কিছুদিন আগে এই দীপিকাই মাঝরাতে জেএনইউ-তে উপস্থিত হয়েছিলেন দেশ-বিরোধী ছাত্র-আন্দোলনে মদত দিতে। তাঁর উদ্দেশ্য যে সৎ ছিল না তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, বলিউডে নিজের বিপুল জনপ্রিয়তার সুযোগে দেশের মানুষকে অনায়াসেই বিভ্রান্ত করতে পারেন তিনি।

সারাবিশ্বেই বলিউড তারকাদের জনপ্রিয়তা প্রশ্নাতীত। আর এতে যেমন সাংস্কৃতিক মানচিত্রে ভারত স্থান করে নিতে পেরেছে, তেমনি দেশের অর্থনীতিও নিঃসন্দেহে উপকৃত হয়েছে। এই সুযোগটাই পুরোদস্তুর গ্রহণ করেছে ইসলামি দুনিয়া। তারা বলিউডের সমৃদ্ধ অর্থনৈতিক ভবিষ্যৎ দেখে এখানে টাকা লাগিয়েছে এবং তাদের অ্যাজেন্ডা পূরণ করার কাজে পেট্রোডলারকে

ব্যবহার করছে। এগুলো মোটামুটি সকলের জানা, কিন্তু ইদানীং আশঙ্কটা আরও ঘনীভূত হচ্ছে কঙ্গনা রানওয়াত নিত্যদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় মুখ খুলছেন আর বোমা ফাটাচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ সত্য কী মিথ্যা তা প্রমাণের আগেই কমিউনিস্ট লবি তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, অভিযোগের গুরুত্ব যথাসম্ভব হ্রাস করে দিতে। ভারতের রাজনীতিতে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি আজ তৈরি হয়েছে। কারোর কোনও কথা বা মত দেশের অনুকূলে গেলে বা শাসক দলের সঙ্গে মিলে গেলে ভারত-বিরোধী মিডিয়া, রাজনৈতিক দল, সেই দলের তাঁবেদার মুখোশের আড়ালে নিজের কদর্য মুখ ঢাকা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী রে রে করে তেড়ে আসবে। রিয়া চক্রবর্তীর ব্যাপারটাও একইরকম।

সুশান্তের মৃত্যু রহস্যের পেছনে পেট্রোডলারের হাত আছে বলে অভিযোগ উঠছিল। সেই কারণে রিয়াকে জিজ্ঞাসাবাদ এবং কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরনোর মতো বলিউডে মাদক চক্রের হদিস। শুধুমাত্র রিয়ার গ্রেপ্তারি বা দীপিকার নাম জড়ানো, এতেই ব্যাপারটা সীমাবদ্ধ নয়। তদন্ত হলে অনেক রাঘববোয়ালের নামই প্রকাশ্যে আসবে বলে শোনা যাচ্ছে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, আগে তো তদন্ত করতে দিতে হবে। তার আগেই যাতে তদন্ত ঠিকমতো না হয়, সর্বতোভাবে সে প্রচেষ্টা হচ্ছে। কখন বিহারিদের গালাগাল দিয়ে, কখনও বাঙ্গালি সেন্টিমেন্টের ধুয়ো তুলে, কখনও হাবিজাবি প্রসঙ্গে এনে নজর ঘুরিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। বলিউডের নানা অপকীর্তি সংঘটিত করা হচ্ছে এদেশের কিছু জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দিয়ে। তাদের পারিশ্রমিক হিসেবে পেট্রোডলারকে ব্যবহার করা হচ্ছে। আপনি বলতে পারেন প্রমাণ কী? খুব খাঁটি কথা। কঙ্গনা রানওয়াত একের পর এক অভিযোগ করছেন, উলটে মহারাষ্ট্র সরকার ও পুলিশ সেই অভিযোগের তদন্ত করার পরিবর্তে নায়িকাকেই হেনস্থা করছে। কঙ্গনা সরকার ও পুলিশের বিরুদ্ধে পালটা মুখ খুলতে বাধ্য হয়েছেন। তাতেই তিনি বিজেপির লোক হয়ে যাচ্ছেন, তাঁর অভিযোগগুলোকেও লঘু করে দেওয়া হচ্ছে।

এই প্রবণতা চলতে থাকলে তা শুধু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির পক্ষেই নয়, দেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও বিপজ্জনক। ভারত এই মুহূর্তে বহিঃশত্রুদের নিয়ে ব্যতিব্যস্ত, যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে দেশ চলছে। সাদা চোখে যে শত্রুকে দেখা যায় না, তার ভয়াবহতা কিন্তু সাংঘাতিক। এই জায়গাটা আমাদের বুঝতে হবে। বলিউডকে দিয়ে দেশের শত্রুরা আমাদের জনমতকে প্রভাবিত করছে। যার প্রমাণ দেখুন কোনও কিছুর মূল্যবৃদ্ধি হলে বা জনমতে প্রভাব ফেলতে পারে, এমন কিছু ঘটলে যার জন্য কেন্দ্রকে কোনোমতেই দায়ী করা চলে না, তবুও সোশ্যাল মিডিয়ায় 'কাদের ভোট দিয়ে এনেছেন দেখুন', কিংবা 'ভোট দিয়েছেন এখন পস্তান' মার্কা স্ট্যাটাস শেয়ার হয়। আসলে জনমত প্রভাবিত করার নানা পন্থা। রাজনীতিতে চক্রাকারে এক দল আসে অন্য দল যায়। তাই রাজনীতির সঙ্গে তাও আপোশ করা চলে কিন্তু দেশের সার্বভৌমত্বের সঙ্গে কোনোভাবেই নয়।

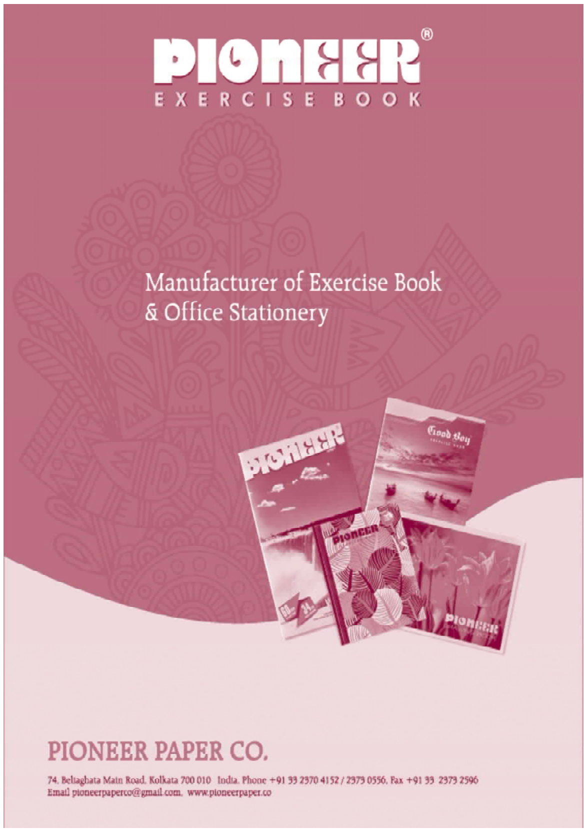

কঙ্গনা রানাউত

রুপোলি পর্দার ঝাঁসির রানি

দেবযানী ভট্টাচার্য

আমি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির গুণমুগ্ধ নই। শিল্পী বা স্টারের স্টারডম বা ভাবমূর্তি যেহেতু সুপরিকল্পিত ও আকর্ষণীয় মোড়কে উপস্থাপিত ব্র্যান্ডমাত্র, ফলে সেই ব্র্যান্ডগুলির বিজ্ঞাপনী দাবি যাই হোক না কেন, বাস্তবে তাঁরা নিতান্ত সাধারণ মানুষ। এই ভাবনা নিয়ে দেখি বলে স্টারডম মূল্যহীন ঠেকে। অভিনেতা বা শো-বিজনেস ব্যক্তিত্ব হিসেবে সাফল্য অর্জন করার বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকলেও, সামগ্রিক মানবিক গুণবত্তার নিরিখে শো বিজনেসের বিরাট ব্যক্তিত্বরা প্রায়শই রামা কৈবর্ত বা রহিম শেখের চাইতেও বেশি সাধারণ হয়ে থাকেন। কিন্তু শো-বিজনেসের বিরাট ব্যক্তিত্বরা প্রায়শই রামা কৈবর্ত বা রহিম শেখের চাইতেও বেশি সাধারণ হয়ে থাকেন। কিন্তু শো-বিজনেস ব্যক্তিত্ব হিসেবে অসাধারণত্ব থাকার কারণে তাঁদের ব্র্যান্ডভ্যালু সাধারণ হয় না। সেটি বরং হয় যত্নলালিত একটি বাণিজ্যিক উপকরণ যার বিপণন হয়ে চলে নিয়মিত। বিপণনই সেই ব্র্যান্ডটিকে করে তোলে 'লার্জার দ্যান লাইফ'। এক একটি স্টারব্র্যান্ডের বিপণনকৌশল এক এক রকম এবং তা কেমন হবে তা স্থির করা হয় স্টারের ভাবমূর্তি বিচার করে। এই ভাবমূর্তিটিও গড়ে তোলা করা হয় বহু পরীক্ষানিরীক্ষার মাধ্যমে, জনগণের চাহিদা ও মানসিকতা পর্যবেক্ষণ করে। স্টার নিজে সেই ভাবমূর্তিটি ক্যারি করেন মাত্র। তাঁর আদত সত্তার সঙ্গে সে ভাবমূর্তির মিল থাকা অবশ্যম্ভাবী নয় এবং এই সবই হয় আধুনিক বিপণনবিজ্ঞানের নীতি মেনে।

কঙ্গনা রানাউত মানুষ হিসেবে আদতে কেমন তা জানা না থাকলেও তাঁর একটি প্রতিবাদী ভাবমূর্তি তৈরি হয়েছে। বিশেষত মণিকর্ণিকা সিনেমাটিতে ঝাঁসির রানির ভূমিকায় অভিনয় করার পর থেকে বাস্তবেও ধীরে ধীরে 'ঝাঁসির রানি'র মতো হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন কঙ্গনা। বহু মানুষ তাঁর সেই ভাবমূর্তিকে গ্রহণ করেছেন। ভারতে যে সময়ে হিন্দু জাতীয়তাবোধের পুনর্জাগরণ ঘটছে সেই সময়ে কঙ্গনার এমন একটি বীরাঙ্গনা-ভাবমূর্তি মানুষ উদ্দীপনার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন। পলিটিক্যাল কারেক্টনেসের তোয়াক্কা না করে সোজাসুজি কড়া কথা বলার যে অভ্যেসটি কঙ্গনা রপ্ত করেছেন, বহু মানুষের তা ভালো লেগেছে। এই ভালো লাগা প্রমাণ করে যে এমন একজন ব্যক্তিত্বের গ্রহণযোগ্যতা সাধারণ মানুষের মধ্যে আছে।

কঙ্গনা রানাউতের জনপ্রিয়তায় বিপুল জোয়ার এসেছে অতি সাম্প্রতিককালে সুশান্ত সিংহ রাজপুতের রহস্যময় মৃত্যুর পর থেকে। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যু বলিউডের সোনার সংসারে গোল বাঁধিয়ে দিয়েছে। অভিনেতার মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ার ঠিক পরেই লেফট লিবারেল লবির পরিচিত ব্যক্তিরা যেইমাত্র অভিনেতার মৃতদেহের ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার বিরোধিতা করেছিলেন, সন্দেহের সূত্রপাত হয়েছিল তৎক্ষণাৎ। লেফট লিবারেল বলে যাঁরা পরিচিত, বর্তমান ভারতবর্ষে তাঁদের একটি নেতিবাচক বিশ্বাসযোগ্যতা তৈরি হয়েছে।

অর্থাৎ তাঁরা যা বলেন, ভারতের এক সুবৃহৎ জনগোষ্ঠী তৎক্ষণাৎ ধরে নেন যে তার ঠিক বিপরীত অভিমতটিই সঠিক। লেফট লিবারেল লবি এক্ষেত্রে কাজ করে একটি নেগেটিভ রেফারেন্স ফ্রেমের মতো। বস্তুত, সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মানসিক স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছিল বলে তিনি আত্মহত্যা করেছেন এবং এমতাবস্থায় তাঁর মৃতদেহের বেদনাদায়ক ছবি মানুষের মনে গেঁথে দেওয়ার প্রয়োজন নেই, বরং অভিনেতার হাস্যময় স্মৃতিই মানুষের মনে চিরস্থায়ী হোক--- এমন একটি অত্যাশ্চর্যরকম মানবিক ও আবেগঘন দাবি লেফট লিবারেল লবি যৌথ ও সঙ্ঘবদ্ধভাবে তুলেছিল বলেই সম্ভবত গোটা ভারতবর্ষ প্রতিবাদে উত্তাল হয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে ফেলেছিল যে সুশান্ত সিংহ রাজপুত আত্মহত্যা করেননি, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। অভিনেতার মৃতদেহের ছবি পোস্ট করতে বারণ করার মাধ্যমে লেফট লিবারেল লবি কিছু গোপন করতে চাইছে বলে সন্দিহান হয়েছিল ভারতবর্ষের মানুষ। লেফট লিবারেলরা যা বলেন, তার উলটোটা সঠিক— এমতো একটি ধারণা ভারতের এক সুবৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বলবৎ হয়েছে এবং জনগণের এই উপলব্ধিটি সম্যক জানেন রিপাবলিক টিভির কর্ণধার অর্ণব গোস্বামী। বাকিটা বর্তমানে সুবিদিত সত্য। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যু রহস্যের তদন্ত করছে সিবিআই, কারণ মুম্বাই পুলিশের তদন্তের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি ভারতের অগুনতি মানুষ এবং সুশান্ত সিংহ রাজপুতের পরিবার। অভিনেতার পরিবারের সদস্যদের মতে সুশান্ত আত্মহত্যা করার ছেলে ছিলেন না। সুশান্তের বোন কীর্তি দাদার মৃত্যুর ন্যায়বিচার চেয়ে জনমত গঠন করে গিয়েছেন অনলস, করে চলেছেন আজও।

এমনই একটা সময় এই ইস্যুতে বিস্ফোরক ও বিতর্কিত মন্তব্য করে বসেন ঠোঁটকাটা কঙ্গনা রানাউত। অভিযোগ তোলের, বলিউডে চলে তীব্র অনৈতিক স্বজনপোষণ। কঙ্গনা বলেন বলিউডে রাজত্ব চলে তাদেরই যারা বিখ্যাত বা ফিল্মি পরিবার থেকে এসেছে। ছোটো শহর থেকে উঠে আসা বা ফিল্ম দুনিয়ার পেডিগ্রি না থাকা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ট্যালেন্ট থাকলেও বলিউডে জায়গা করে নেওয়ার জন্য তাদের এমন সংঘর্ষের মুখোমুখি হতে হয় যা চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা বা মনের জোর সকলের থাকে না। সুশান্ত সিংহ রাজপুত যদি আত্মহত্যাও করে থাকেন, তবে তার জন্যও দায়ী বলিউডের পরিবেশই। কঙ্গনার এই মন্তব্য ঝড় তোলে সোশ্যাল মিডিয়ায়, কারণ কঙ্গনা যা বলেছিলেন তা ছিল জনগণের 'মনের কথা'। এদেশের মানুষ বলিউডের খানেদের স্টারডমকে অ্যাডমায়ার করে ঠিকই, কিন্তু বলিউড যে খানেদের এবং করণ জোহরের মতো খানদানি প্রডিউসার হাউসের অঙ্গুলিহেলনে চলে, সেই বিষয়টা সাধারণ ভারতীয়ের না-পসন্দ। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যু এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে কঙ্গনা রানাওয়াতের মন্তব্য ও বিষয়ে জনমনে জমাট ক্ষোভের আগল খুলে দেয়। লাভাস্রোতের মতো বেরিয়ে আসতে থাকে তথাকথিত সফল মেগাস্টারদের প্রতি মানুষের মনে জমে থাকা ক্ষোভ। এই ক্ষোভের পিছনে ঈর্ষার আগুনও যে নেই, তা নিশ্চিত করে বলা যায় কি?

এটুকু বলেই ক্ষান্ত হন না কঙ্গনা রানাওয়াত। বলিউডের স্বজনপোষণের পরিবেশের সঙ্গে রাজনৈতিক লবির যুক্ত থাকার অভিযোগও তিনি তোলেন। ইঙ্গিত করেন শিবসেনার দিকে। সুশান্তের মৃত্যুর তদন্ত করতে এসে মুম্বাই পুলিশ আদতে প্রমাণ লোপাট করছে এবং তা করেছে শিবসেনার রাজনৈতিক মদতে, এমন অভিযোগ উঠেছিল আগেই। কঙ্গনার মন্তব্য সেই জল্পনার আগুনে ঘি ঢালে। শিবসেনার মৌচাকে ঢিল ছোঁড়ায় শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত কঙ্গনাকে হুমকি দিয়ে বসেন যে মুম্বাইয়ে পা রাখলে অভিনেত্রীকে দেখে নেওয়া হবে। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মতো কঙ্গনাও সেলফ-মেড অভিনেত্রী। বলিউডে নিজের পরিচিতি তৈরি করেছেন লড়াই করে, কোনো পেডিগ্রির জোর ছাড়া। সঞ্জয় রাউতের হুমকির জবাবে তিনি বলে বসেন যে সুশান্তের মৃত্যুর পর মুম্বই ফিরতে তাঁর ভয় করছে, তিনি অসুরক্ষিত বোধ করছেন। মুম্বইয়ের পরিবেশ তাঁর কাছে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের মতো মনে হচ্ছে। এই মন্তব্যের সঙ্গে সঙ্গেই সোশ্যাল মিডিয়া ও পত্রপত্রিকায় শুরু হয়ে যায় আর এক প্রস্থ বাকযুদ্ধ। মুম্বইয়ের সঙ্গে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের তুলনা করায় লেফট লিবারেল লবির নামিদামি সাংবাদিকরাও কঙ্গনা রানওয়াতকে বিঁধেতে থাকেন অনবরত। তবে বিপুল জনসমর্থন পান কঙ্গনা। সাধারণ ভারতীয়ের মনে হতে থাকে যে, অভিনেতা নাসিরুদ্দিন শাহ যদি অকিঞ্চিৎকর কারণে ভারতবর্ষের পরিবেশ তাঁর সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য ভীতিপ্রদ হয়ে উঠছে বলে মন্তব্য করতে পারেন, ভারতবর্ষে তিনি আর বাস করতে পারবেন কী না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করতে পারেন এবং তাঁর সেই বক্তব্যকে ভারতীয় মিডিয়ার একাংশ যদি মহাসমারোহে উদযাপনও করতে পারে, তবে কঙ্গনার ভয়কে তারা অনুরূপ নির্লিপ্তির সঙ্গে নিতে পারছে না কেন? কেন মুম্বইয়ের সঙ্গে পাক অধিকৃত কাশ্মীরের তুলনা শুনে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল হচ্ছেন? বাকস্বাধীনতা তো উভয়ক্ষেত্রেই সমান এবং উভয়েই যা ব্যক্ত করেছেন তা তাঁদের নিজস্ব অনুভূতি মাত্র।

ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয়েছিল কঙ্গনার মন্তব্য অতিশয়োক্তি হলেও রাজনৈতিকভাবে বুদ্ধিদীপ্ত। ওই মন্তব্য করেই নিজের সরকারি সুরক্ষা সুনিশ্চিত করেছিলেন কঙ্গনা রানাউত এবং নিজের ওপর টেনে নিয়েছিলেন আরও খানিক প্রচারের আলো। কঙ্গনার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় শিবসেনা নেতা সঞ্জয় রাউত যেভাবে প্রকাশ্য সাক্ষাৎকারে তাঁকে 'হারামখোর লড়কি' বলে গাল পাড়েন, তাতে লজ্জিত হয় সৌজন্যের সমস্ত সীমা। ফলে মুম্বই পৌঁছনোর আগে ভারত সরকারের তরফ থেকে ওয়াই প্লাস ক্যাটিগরির নিরাপত্তা প্রাপ্ত হন কঙ্গনা । এটি কঙ্গনার একটি কৌশলগত জয়। কঙ্গনা রানাউতকে ওয়াই প্লাস নিরাপত্তা দেওয়ায় ভারতবর্ষের বিরোধী রাজনীতিকরা সন্তুষ্ট হতে পারেননি। তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র প্রশ্ন তুলেছিলেন যে ভারতে যেখানে প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় পুলিশের সংখ্যা মাত্র ১৩৮ জন, সেখানে বলিউডের একজন টুইটার-স্টারের ওয়াই প্লাস সুরক্ষা পাওয়া কতদূর যুক্তিযুক্ত? মহুয়া মৈত্রের এ প্রশ্ন বাস্তবে ছিল একটি সেমসাইড গোল। কারণ প্রতি লক্ষ জনসংখ্যায় পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের সংখ্যা ২০১৮ সালে ছিল ৭৭ জন ও ২০১৯-এ তা হয়েছে ৯১

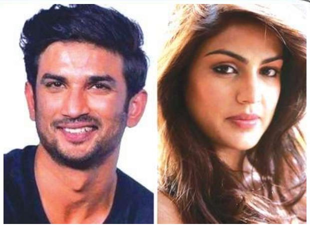

সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর সঙ্গে নাম জড়িয়েছে তারই বান্ধবি রিয়া চক্রবর্তীর। সুশান্তের মৃত্যু রহস্যের তদন্ত করছে সিবিআই। কারণ মুম্বাই পুলিশের তদন্তের ওপর আস্থা রাখতে পারেননি ভারতের অগুনতি মানুষ এবং সুশান্ত সিংহ রাজপুতের পরিবার। তাদের আশঙ্কা সুশান্তের মৃত্যুর পেছনে রয়েছে বলিউডেরই একাংশ।

জন। অর্থাৎ তৃণমূল শাসিত পশ্চিমবঙ্গে যেখানে পুলিশ ও জনসংখ্যার অনুপাত জাতীয় অনুপাতের চাইতেও অনেক কম এবং তৎসত্ত্বেও যেখানে প্রশান্ত কিশোরের মতো একজন ফ্রিল্যান্স প্রফেশনালকে জেড ক্যাটিগরির সুরক্ষা দেওয়ার বোঝা বয়ে চলেছে পশ্চিমবঙ্গ সরকার, সেখানে রাজনৈতিক নেতার হুমকি পাওয়ার পর একজন সর্বভারতীয় অভিনেত্রী (পাবলিক ফিগার) ওয়াই প্লাস ক্যাটিগরির সুরক্ষা ভারত সরকারের কাছ থেকে কেন পেতে পারেন না, সে প্রশ্ন উঠেছে। মহুয়া মৈত্রের মন্তব্য বরং এ রাজ্যে পুলিশ-পরিকাঠামোর দৈন্যদশা সম্বন্ধে সচেতন মানুষকে আরও একবার মুখ খোলার সুযোগ করে দিয়েছে।

বহুমূল্য যে প্রশ্নটি কঙ্গনা রানাউত তুলেছেন তা হলো, তাঁর যদি সত্যিই মুম্বইয়ের পরিস্থিতিকে ভীতিপ্রদ বলে মনে হয়, তবে তিনি তা বলতে পারবেন না কেন। বাকস্বাধীনতার অধিকার কি তাঁর নেই? তিনি অভিযোগ করেন যে সোজাসাপ্টা কথা বলার অভ্যেসের জন্য ২০১৬ সালে এক 'মুভি মাফিয়া' তাঁকে 'সাইকো' আখ্যা দিয়েছিলেন ও ২০২০-তে এসে এক রাজনৈতিক নেতা তাঁকে প্রকাশ্যে বললেন 'হারামখোর লড়কি'। এগুলো কি অসহিষ্ণুতা নয়? তাহলে ভারতবর্ষে রাজনৈতিক দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে যাঁরা প্রায়শই অসহিষ্ণুতার অভিযোগ তোলেন, কঙ্গনা রানওয়াতের অপমানে তাঁরা চুপ করে আছেন কেন? 'মুভি মাফিয়া' বলে কঙ্গনা আঙুল তুলেছিলেন করণ জোহরের দিকে। কঙ্গনার আদত প্রশ্ন ছিল— কোনো মানুষ যদি তাঁর মনের অনুভূতি রাখঢাকহীনভাবে ব্যক্ত করে, তবে তাকে হুমকি শুনতে হবে কেন? এ প্রশ্ন সঙ্গত। বাকস্বাধীনতা কারুর ব্যক্তিগত মালিকানাধীন বিষয় নয়। কোনো ব্যক্তি যদি তার আশঙ্কা ও অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে এমন কিছু বলে ফেলে যা সকলের জন্য সহজপাচ্য নয়, তবে কি সেই অপ্রিয় কথা বলার জন্য তাকে রাজনৈতিক লবির হুমকি পেতে হবে? সেক্ষেত্রে তার নিরাপত্তাবোধ কি আরও বেশি বিঘ্নিত হবে না?

শিবসেনার সঙ্গে কঙ্গনার সংঘাত তারপর আরও বাড়ে। মুম্বইয়ে কঙ্গনার প্রডাকশন হাউজ মণিকর্ণিকা ফিল্মসের অফিস বিল্ডিংটি একটি বেআইনি কাঠামো— এই অভিযোগ সেটি ভেঙে ফেলার উদ্যোগ নেয় বিএমসি বা বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন। কঙ্গনা টুইট করেন যে তাঁর বাড়িতে কোনো বেআইনি কাঠামো নেই। টুইটারের মাধ্যমে তিনি নেটিজেনদের জানান যে তাঁর বাড়ির ইন্টেরিয়র নষ্ট করে দিচ্ছে বিএমসি। শিবসেনার সঙ্গে নিতান্ত মৌখিক সংঘাতের জেরে বম্বে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন যে তাঁর বাড়ি ভেঙে দেওয়ার উদ্যোগ নিল, এমন ঘটনাকে গণতন্ত্রের মৃত্যু বলে বর্ণনা করেন কঙ্গনা। তাঁর আইনজীবীরা আদালতের দ্বারস্থ হওয়ায় বম্বে হাইকোর্টের অর্ডার শেষ পর্যন্ত সেই ভাঙচুর থামায়। কঙ্গনা রানাউতের মৌখিক অভিযোগ কেন শিবসেনাকে এতখানি প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলল এবং ভারতীয় গণমাধ্যমের একটা বড়ো অংশ কেন প্রতিক্রিয়াশীলতা নিয়ে শিবসেনার যথেষ্ট নিন্দা করল না, উঠেছে সে প্রশ্নও।

কঙ্গনা রানাউতের প্রতিবাদী ভাবমূর্তি জনমোহিনী হলেও তাঁর অপর একটি সোজাসাপ্টা মন্তব্য তাঁর বহু গুণমুগ্ধের মনে অপ্রত্যাশিত আঘাত হেনেছে। সুশান্ত সিংহ রাজপুতের মৃত্যুর তদন্ত করতে গিয়ে ড্রাগআসক্তির বিষয়টি একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে আসায় নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো একের পর এক জেরা করছে বলিউডের স্টারদের। জেরায় ডাক পড়েছে দীপিকা পাড়ুকোনেরও। শোনা গিয়েছে প্রবল মাদকাসক্তির সঙ্গে সঙ্গে দীপিকা পাড়ুকোন মানসিক অবসাদেরও শিকার। সে প্রসঙ্গে আক্রমণাত্মক মন্তব্য করতে গিয়ে কঙ্গনা বলে ফেলেছেন যে মানসিক অবসাদও ড্রাগের নেশারই ফলশ্রুতি বৈ নয়। কঙ্গনার এমন মন্তব্য আঘাত করেছে তাঁর বহু এমন গুণমুগ্ধ ভক্তকে যাঁরা জীবনে হ্যালুসিনোজেনিক, নার্কোটিক ড্রাগ নেননি অর্থাৎ যাঁরা ড্রাগ-আসক্ত নন, কিন্তু তৎসত্ত্বেও নিজেরা মানসিক অবসাদের শিকার হয়েছেন। এঁদের অনেকেই এতদিন ধরে কঙ্গনাকে সমর্থন জানিয়ে এসেছেন নিরবচ্ছিন্নভাবে। কিন্তু মানসিক অবসাদের মতো মারাত্মক মানসিক রোগটি সম্বন্ধে কঙ্গনার এমন দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্য তাঁদের মর্মাহত করেছে। বস্তুত, কঙ্গনার এই মন্তব্যের অসংবেদনশীলতা ও ঔদ্ধত্য আর সঞ্জয় রাউতের 'হারামখোর লড়কি' বলার অসংবেদনশীলতা ও ঔদ্ধত্য একই গোত্রীয়। 'রুপোলি পর্দার ঝাঁসির রানি' থেকে বাস্তবেও 'ঝাঁসির রানি লক্ষ্মীবাঈ'-এর মতো বীরাঙ্গনা হয়ে উঠতে গেলে আক্রমণাত্মক হওয়ার পাশাপাশি আরও সংযত ও অনুভূতিশীল হতে হবে কঙ্গনা রানাউতকে। ■

অতিথি কলম

হরদীপ সিংহ পুরী

কৃষি বিলের মাধ্যমে আনা গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনীগুলি রাজনীতি করে নষ্ট করা অনুচিত

সাম্প্রতিক অনুমোদিত হওয়া ঐতিহাসিক বিলগুলির মাধ্যমে কৃষক নিজের ইচ্ছায় উৎপাদিত পণ্য বিক্রি করে বাড়তি লাভ করতে পারবে। বহু বিকল্প খুলে যাওয়ায় পণ্য বিক্রির নতুন সুযোগ আসবে। বিরোধীদের এ নিয়ে কৃষককে বিভ্রান্ত করা অন্যায়। প্রধানমন্ত্রী ও কৃষিমন্ত্রী একাধিকবার নিশ্চিত করেছেন যে বর্তমানে লাগু থাকা ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (এমএসপি) ও সরকারের তরফে ফসল ক্রয়ের প্রক্রিয়া চালু থাকবে। এই নতুন কৃষি বিল তাকে কোনোভাবে বদলাবে না।

স্বাধীনতার সময় জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কৃষির অবদান ছিল ৫০ শতাংশ। কৃষিতে কাজ করতেন কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৭০ শতাংশ। ২০১৯ সালে এসে কৃষি থেকে জাতীয় আয়ের মাত্রা ১৬.৫ শতাংশ কিন্তু কৃষিকাজে এখনও যুক্ত আছেন শ্রমশক্তির ৪২ শতাংশ। এই দীর্ঘ সময় ধরে যে রাজনৈতিক দলগুলি দেশ শাসন করেছিল তারা সর্বদা কৃষকের আয় বৃদ্ধির গান শোনাত। তাদের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায় কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জনে ত্রুটি রাখত না। কৃষকের আয় প্রায় একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকার ফলে তারা দারিদ্র ও দুর্দশার কবলে পড়ে প্রায়শই আত্মহত্যার পথ বেছে নিত।

ইতিমধ্যে কৃষকের সংকট মোচনে নানা কমিশন, কমিটি বসাতে কোনো ত্রুটি ছিল না। কিন্তু তাদের নির্দেশিত কৃষি পণ্যের বাজারকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার যুক্তিকে শাসকরা কেবল মুখের কাথায় মান্যতা দিত। রূপায়ণের বেলায় লবডঙ্কা। যুগের পর যুগ কেটেছে নিষ্ফলা। এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, আজ যখন প্রধানমন্ত্রী দীর্ঘ দিনের বঞ্চনার অবসন ঘটিয়ে সেই কমিশনগুলির বিভিন্ন সময়ে দেওয়া উপদেশগুলিকে কার্যকর করতে উপযুক্ত সংস্কার নিয়ে এলেন ঠিক তখনই বিরোধী দলগুলি ভুল খবর ছড়াতে লাগল। কৃষকের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে নিজেদের রাজনৈতিক লাভ জোটাবার নেশায় মেতে উঠল। সকলেই জানেন ভারতের কৃষি জমিগুলি অতি ছোটো ছোটো জোতে বিভক্ত। বহু ক্ষেত্রেই একান্তভাবে প্রকৃতি নির্ভর। উৎপাদনের পরিমাণ সম্পর্কে কৃষক থাকে অনিশ্চিত। উৎপাদিত পণ্যের বড়ো অংশ অপচয় হয় , কেননা বাজারের খামখেয়ালিপনায় দামের স্থিরতা থাকে না। এই সমস্ত কারণে কৃষি ক্ষেত্র ক্রমশ ঝুঁকিপূর্ণ ও অদক্ষ হয়ে উঠছিল। বিনিয়োগ ও তা থেকে লাভ ওঠানো অনিশ্চিত হয়ে পড়ছিল। এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবিলায় উচ্চ উৎপাদনশীলতা, পণ উৎপাদনের সঠিক খরচ ও উৎপাদনের পর লাভজনক মূল্যে তার বিক্রয়ের মাধ্যমে কৃষকের আয় বৃদ্ধি ছিল সময়ের দাবি। মোদী সরকার এই লক্ষ্যে বহু পদক্ষেপ নিয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, স্বামীনাথন কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ন্যূনতম সহায়ক মূল্য যেন উৎপাদন খরচের ওপর বাড়তি ৫০ শতাংশ হয় তা লাগু করা। বিগত ১০ বছরে কৃষিক্ষেত্রে সরকারি বাজেটে বরাদ্দ ১১ গুণ বাড়ানো। বিভিন্ন ক্ষেত্রে ই-এনএএম মান্ডি স্থাপন, আত্মনির্ভর প্রকল্পে ১ লক্ষ কোটি টাকার কৃষি পরিকাঠামো উন্নয়ন ফান্ড গঠন প্রভৃতি।

বিগত সপ্তাহে পাশ হওয়া কৃষি বিলে কৃষকদের জন্য এমন ব্যবস্থা করা হয়েছে যেখানে তারা উৎপাদিত পণ্য ইচ্ছেমতো বিক্রি করার বহু ক্রেতা পাবে। এই প্রতিযোগিতামূলক বাজারে যে সর্বোচ্চ মূল্য দেবে কৃষক তাকেই বেচতে পারবে, কেননা এমএসপি তো আগের মতো বহালই থাকছে। যাতে বাড়তি দাম পাওয়ার সুযোগ তৈরি হচ্ছে সেটাই বাড়তি লাভ। ক্রেতাও তার পছন্দমতো সেরা জিনিসটি বাড়তি দাম দিয়ে কিনে নেওয়ার স্বাধীনতা পাবে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে এই বিলের ফলে কৃষক অনায়াসে সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের বাজারের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত হয়ে যেতে পারবে। যুক্ত হয়ে যেতে পারবে তার নিজস্ব রাজ্যেরও অজস্র মান্ডির সঙ্গে কোনো রাজ্য কৃষিপণ্য বিক্রির বিশেষ ভাবে নির্দিষ্ট মান্ডিতে মাল বিক্রির বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এই প্রক্রিয়ায় কৃষকের মাল কেনার জন্য অজস্র সম্ভাব্য ক্রেতা তার দরজায় হাজির হবে। কৃষকেরই হাতে থাকবে বিক্রির নিয়ন্ত্রণ।

এই কৃষি বিলে কৃষককে যারা চাষে নিযুক্ত করার প্রকল্প নেবে তাদের সঙ্গে কৃষকদের অগ্রিম যথাযথ চুক্তি হবে। এর ফলে কৃষিপণ্যের উৎকর্ষতা ও উপযুক্ত দামের নিশ্চয়তা আগেই নির্ধারিত হয়ে থাকবে। এই চুক্তির পরিধি এমন হবে বিমা ও অন্যান্য ঋণ নেওয়ার মাধ্যমকে যুক্ত করে বাজারের দামের অনিশ্চয়তা কৃষকের থেকে আগেভাগেই ফসল ক্রেতার ওপর ন্যস্ত থাকবে। কৃষক দাম পড়ে যাওয়ার ভবিষ্যৎ ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাবে। সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ও তার কৃৎকৌশলও যাতে কৃষকের আয়ত্তাধীন হয় সে ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। এই সুপারিশগুলি

অতীতে বহুবার এসেছে। স্বামীনাথন কমিটিও মান্ডিতে পণ্য বিক্রিজনিত কর প্রত্যাহার, সারা দেশের মধ্যে বাজার সৃষ্টি ও চুক্তি চাষ প্রবর্তনেরই সুপারিশ করেছিল।

পর্যালোচনা করলে অবাক হতে হবে, ২০১৯ সালের কংগ্রেস ইস্তাহারে পরিষ্কার APMC (Agricultural Produce Markting Corporation) আইনে পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। যার ফলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে পণ্য বিক্রয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানি ক্ষেত্রে থাকা বাধাগুলি দূর করার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। শুধু তাই নয়, ইস্তাহারে অত্যাবশকীয় পণ্য আইন তুলে দেওয়ার মাধ্যমে কোনো সরকারি নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই মর্জিমাফিক নিজের পণ্য বিক্রির প্রতিশ্রুতিও ছিল।

এ প্রসঙ্গে পঞ্জাবের রাজ্য নির্বাচনের ইস্তাহারে উল্লেখিত এপিএমসি আইনে পরিবর্তন এনে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে ও আন্তর্জাতিক বাজারে কৃষকদের মাল বিক্রির স্বাধিকার দেওয়ার কথা উল্লেখিত ছিল। একটি Agricultural Production Board গঠনের কথাও বলা হয়েছিল যারা বিশেষ করে চুক্তি চাষের বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবে। জমি লিজ দেওয়ার সঙ্গে কৃষকদের চুক্তি চাষের কাগজের খুঁটিনাটি দেখে তাদের স্বার্থ সংরক্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করতে আইন আনার কথা ছিল। হায়! ২০ সেপ্টেম্বর যখন কৃষি বিলটি পাশ হলো সঙ্গে সঙ্গে বিরোধীদলগুলি ভয়ংকর বিদ্বেষমূলক প্রচার শুরু করল যে বিলটি এমএসপি প্রথা তুলে দেবে।

কৃষকদের জমি কেড়ে নিয়ে তাদের বিভিন্ন করপোরেট সংস্থার ক্রীতদাস বানিয়ে তুলবে। এর চেয়ে বড়ো অসত্য আর কী হতে পারে? প্রধানমন্ত্রী থেকে কৃষিমন্ত্রী যে কতবার নিশ্চিত করেছেন যে এই বিলে এমএসপি তুলে দেওয়ার কোনো কথা নেই তা যেমন ছিল তেমনি থাকবে। বাস্তবে এই সরকারের বিগত পাঁচ বছরে ধানের ও গমের এমএসপি যথাক্রমে ২.৪ ও ১.৭ গুণ বাড়ানো হয়েছে। এই নতুন বিল অনুযায়ী বিক্রির সময় কোনো কর না চাপানোর ফলে কৃষকরা আরও বেশি বিক্রয় মূল্য পাবে। তাদের স্বার্থ আরও সুরক্ষিত হবে। অন্যদিকে এপিএমই আইনে যত মান্ডি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তারা তেমনি থাকবে। রাজ্যে রাজ্যে এই আইন রাজ্যের নিয়ন্ত্রণেই থাকবে। কৃষকদের যাতে ঠকিয়ে কম দাম দিয়ে তাদের পণ্য না বিক্রয় করতে হয় তা ঠেকাতে এই বিলে অনেক রক্ষাকবচ আছে। উদাহরণ স্বরূপ কৃষকদের জমির লিজ ও বন্ধক আটকানোর সঙ্গে সঙ্গে কোনো ক্ষেত্রে বকেয়া টাকা আদায় করতে কৃষকের জমি অন্য কারুর বিক্রি করে দেওয়ার ক্ষমতা থাকবে না। চুক্তি চাষের সময় ভাগচাষি ও ক্ষেত মজুরের যাতে স্বার্থহানি না হয় তার ব্যবস্থাও বিলে রয়েছে। চুক্তিতে একটি দাম নিশ্চিত দেওয়ার গ্যারান্টি-সহ চাষির হাতে আরও উচ্চ দাম আদায় করার ক্ষমতাও খোলা থাকবে। চুক্তি চাষের সময় কৃষকের দায়িত্ব শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কেনার অগ্রিম নেওয়া ও চুক্তিকারীর কাছ থেকে সার ও বীজের খরচ নেওয়া।

চুক্তিকারী প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির দায়িত্ব বর্তাবে নির্দিষ্ট সময়ে চাষির মালের মূল্য চোকানো ও চাষির মাল তুলে নিয়ে যাওয়া। কোনো বিকর্ত দেখা দিলে তা মেটাবে মহকুমা শাসকের অধীনে নির্মিত সালিশি বোর্ড। যদি সমাধান না হয় সরাসরি মহকুমা শাসকের কাছে অভিযোগ জানানো যাবে যাতে তা মিটে যায়। মহকুমা শাসক ক্ষেত্র বিশেষে জরিমানা ও চাষির সঙ্গে চুক্তিরত ওই ব্যবসায়ীকে ফসল বিক্রি নিষিদ্ধ করতে পারে। এই আলোচনা ও বিলের পূর্ণাঙ্গ অধ্যয়ন করলে দেখা যাবে দেশের কৃষি ক্ষেত্রে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনে অপচয় বন্ধ, উৎকর্ষতা বৃদ্ধি, কৃষকের সর্বোচ্চ মূল্য সংগ্রহ করে আয় বৃদ্ধির দীর্ঘমেয়াদি সংস্কার রয়েছে।

অন্যদিকে ব্যবসায়ীরা লাভ বাড়াতে আরও বেশি হিমঘর নির্মাণ, কৃষককে উৎকৃষ্ট উৎপাদনে সহায়তা মাটি পরীক্ষা করে উন্নত বীজ ও আন্তর্জাতিক পরিকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা করবে। রাজনৈতিক কু-উদ্দেশ্য মেটাতে মিথ্যাচারের মাধ্যমে এ বিলের বিরোধিতা সময়োপযোগী কৃষি সংস্কার আটকে দেশ বিরোধী কাজ করার সমান।

(লেখক বিমান পরিবহণ মন্ত্রী)

শোক সংবাদ

মালদা জেলার গাজোল খণ্ডের ময়না মণ্ডলের পূর্বতন কার্যবাহ জয়ন্ত বর্মন গত ২২ আগস্ট পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি মা, সহধর্মিণী ও ২ পুত্র রেখে গেছেন।

* * *

বাঁকুড়া জেলার রানিবাঁধ খণ্ডের তাঁতিবেড়িয়া শাখার প্রবীণ স্বয়ংসেবক তথা পূর্বতন খাতড়া মহকুমা কার্যবাহ গোষ্ঠবিহারী মাঝি গত ২৩ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৬ বছর। তিনি সহধর্মিণী, ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। তিনি একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। মহকুমা কার্যবাহের দায়িত্ব পালনের পর বিভিন্ন সময়ে তিনি হিন্দু জাগরণ মঞ্চের বাঁকুড়া জেলার প্রমুখ, ধাতকিডিহি সারদা শিশু মন্দিরের পরিচালন সমিতির সম্পাদক, ভারতীয় জনতা পার্টির রানিবাঁধ মণ্ডল সভাপতি প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর দুই পুত্রই স্বয়ংসেবক।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের তারকেশ্বর জেলার মশাট খণ্ডের স্বয়ংসেবক এবং বিবেকানন্দ বিদ্যা বিকাশ পরিষদের হুগলী জেলা সম্পাদক অনুপ দাসের মাতৃদেবী মিনতি দাস গত ২১ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি স্বামী, ২ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

ভ্রম সংশোধন

গত ২১ সেপ্টেম্বর সংখ্যায় চিঠিপত্র বিভাগে 'কেরালার একশো শতাংশ সাক্ষরতা, বামেদের কৃতিত্ব নয়' চিঠিটিতে আমার দিক থেকে ভুল হয়েছে : **১৯৯২ সালে স্বামীজী যখন কেরলে গিয়েছিলেন** স্থলে **১৮৯২** এবং ২০১০ সালের হিসেব অনুযায়ী গ্রামীণ এলাকায় মাত্র ৪ **শতাংশ** ছাত্র-ছাত্রী সরকারি বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করছে স্থলে ৪৭ **শতাংশ** হবে। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থী।

— মানস কর, কোচবিহার

বিশেষ প্রতিবেদন

আল-কায়দাও পৌঁছে গেল

মুখ্যমন্ত্রী এবার মুখোশটা খুলুন

সুজিত রায়

অনেক দিন আগে থেকেই বিভিন্ন মহল থেকে অভিযোগ উঠছিল। অভিযোগের প্রমাণও মিলছিল বারে বারেই। কোথাও কোনো সন্দেহ আর ছিল না। সেপ্টেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে একেবারে হাতেনাতে ধরা পড়ল কলকাতা শহরের নাকের ডগায় মুর্শিদাবাদে খোদ আলকায়দা জঙ্গি গোষ্ঠী বাসা বেঁধেছে। অর্থাৎ রাজ্যের এবং রাষ্ট্রেরও শিয়রে শমন হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে খোদ ওসামা বিন লাদেনের জঙ্গিবাহিনী যারা মার্কিন সাম্রাজ্যের গর্ব টুইন টাওয়ারকে ধ্বংস করে দিয়েছিল একটা গোটা বিমানকেই বিস্ফোরকের মতো ব্যবহার করে।

অনেক পরে হলেও ওসামাকে নিকেশ করেছে মার্কিন সরকার একেবারে পাকিস্তানে তাঁর গোপন আশ্রয়ে ঢুকে রাতের অন্ধকারে। তারপর দেহটা ভাসিয়ে দিয়েছে সাগরে শেকল বাঁধা অবস্থায়। কিন্তু আল কায়দা শেষ হয়ে যায়নি। বাপের উত্তরাধিকার বহন করছে তারই সন্তান। আর তারই ভাবশিষ্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গকে জঙ্গিবাহিনীর নিখাদ স্বর্গরাজ্যে পরিণত করেছে এ রাজ্যেরই আবু সুফিয়ান, মাইনুল মণ্ডল, লিয়ন আহমেদ, আল মাসুন কামাল, আতিউর রহমান, নাজমুল সাকিব, মোশারফ হোসেন, ইয়াকুব বিশ্বাস, মুর্শিদ হাসান।

না, এদের জঙ্গি বলে কেউ চেনে না। পুলিশও না। কারণ পেশায় এরা কেউ দর্জি, কেউ রাঁধুনি, কেউ ড্রাইভার, কেউ পরোটার দোকানের কর্মী, কেউ পোশাক বিক্রি করে, কেউ পরিযায়ী শ্রমিক, কেউ-বা ছাত্র। অপরাধমূলক কাজকর্মের ব্যাপারে এদের কারোরই কোনো পূর্বপরিচিতি নেই। এমনকী ডোমকলের লিয়ন আহমেদও যে পেশায় কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ।

রাজ্যের নিশ্চয়ই ভুলে যাননি, মুর্শিদাবাদেরই খাগড়াগড়ের সেই বোমা তৈরির গোপন আস্তানায় বিস্ফোরণ এবং একাধিক মৃত্যুর ঘটনা। সেটা ছিল প্রদীপের সলতে। এবারকার আবিষ্কার একেবারে পরমাণু বিস্ফোরণের মতোই মারাত্মক। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা বা ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)-র একগুচ্ছ বাঘা বাঘা তদন্তকারী গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও কেরলের এর্নাকুলামে আলকায়দা জঙ্গিবাহিনীর হদিশ পায়। কেরলেও অপারেট করছিল যারা তারাও পশ্চিমবঙ্গেরই বাসিন্দা। এদের দায়িত্ব ছিল কেরলে শক্ত ঘাঁটি তৈরি করা।

এই গোষ্ঠীটি তৈরি হচ্ছিল দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়ে নিরীহ মানুষের ওপর আক্রমণ হানা। তাদের মূল লক্ষ্য ছিল রাজধানী দিল্লি ও কাশ্মীর । গত ১৯ সেপ্টেম্বরের ভোরে এনআইএ-র এই অভিযানে ধরা পড়ে বোমা তৈরি এবং মজুত করার জন্য মাটির তলায় গোপন কুঠুরি। এদের কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছে বিপুল পরিমাণে ডিজিটাল ডিভাইস, তথ্য, জিহাদি পত্রিকা, ধারালো অস্ত্র, দেশি বন্দুক, স্থানীয়ভাবে তৈরি বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট এবং বিস্ফোরক বানানোর গাইডলাইন-সহ একাধিক বইপত্র।

ধৃতরা সকলেই অল্পবয়সী। তবে আলকায়দার ইন্ডিয়ান মডিউলের নেতা আবু সুফিয়ান মধ্যবয়স্ক। দর্জির পেশাটা ছিল তার মুখোশ। তার বাড়িতেই মিলেছে মাটির নীচে গোপন কুঠুরি। এনআইএ-র কাছে খবর রয়েছে, ইতিমধ্যে তিন যুবক পাকিস্তানে জঙ্গি শিবিরে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। এরা সকলেই সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গেরই বাসিন্দা। ইতিমধ্যে এই সুফিয়ানের নেতৃত্বেই আলকায়দা ডানা ছড়িয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা ও বীরভূমে এবং এদের সমস্ত কার্যকলাপই সীমাবদ্ধ শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মাবলম্বী ভারতীয়ের মধ্যে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, সাধারণভাবে ধৃতরা সকলেই গরিব পরিবারের সন্তান। মধ্যপ্রাচ্যের আলকায়দা গোষ্ঠী পাকিস্তানের সাহায্য নিয়ে (সম্ভবত বাংলাদেশেরও) প্রচুর টাকা পয়সা লোভ দেখিয়ে ওইসব যুবকদের ফাঁদে ফেলে। খোঁজখবর নিয়ে দেখা গেছে, এদের অনেকেই বেশ বড়োমাপের ঘরবাড়ি বানিয়েছে। যে পরিমাণ অর্থ তারা খরচ করেছে, তা তাদের আয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্যবিহীন। এ থেকেই পরিষ্কার, রাজ্যের মুসলমানদের আর্থিক দুরবস্থার সুযোগ নিয়েই আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী আলকায়দা পশ্চিমবঙ্গের জঙ্গিদের নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে ব্যবহার করতে পারছে।

পশ্চিমবঙ্গকেই বেছে নিচ্ছে জঙ্গিরা নিরাপদ আশ্রয় হিসেবে, সেই নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। শুধু প্রশ্নই নয়, বিতর্কও শুরু হয়েছে নানা মঞ্চে। বামফ্রন্ট সরকারের শেষ পর্যায়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য একটা বিবৃতিতে বলেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গ বারুদের স্তূপের ওপর বসে রয়েছে। রাজ্যের প্রতিটি মাদ্রাসা এক একটি সংখ্যালঘু সন্ত্রাসী তৈরির কারখানা। রাজনীতির স্বার্থে সেদিনও বামফ্রন্ট মুখ্যমন্ত্রী চরম সত্য স্বীকার করলেও কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। গত ১০ বছরে সেই সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বেড়েছে কয়েকশো গুণ। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে। মুসলমান অধ্যুষিত জেলাগুলি এখন প্রায় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। ঘরে ঘরে তৈরি হয়েছে মুসলমান জেহাদি। পশ্চিমবঙ্গ সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়েছে। রাজ্য সরকার সব বুঝেও মুখ ঘুরিয়ে রয়েছে। কারণ জিহাদিদের গায়ে হাত দেওয়া মানেই ভোটবাক্সে তার প্রভাব পড়া।

নির্বাচনী অঙ্ক প্রমাণ করেছে বারে বারে, তৃণমূল কংগ্রেস দলের ৪৪ শতাংশ ভোটের প্রায় ১৪ শতাংশ জুড়েই রয়েছে মুসলমান ভোট। কারণ মুসলমান তোষণের এমন নির্লজ্জ নজির ভারতবর্ষের আর কোনোদিন কোনো সরকার সৃষ্টি করেনি। বামফ্রন্ট সরকার যেমন ৩৪ বছরের প্রশাসনে মুসলমানদের সামগ্রিক উন্নয়নের জন্য কোনো বাস্তববাদী প্রকল্প হাতে নেয়নি, তৃণমূল সরকারও গত ১০ বছরে হেঁটেছে সেই একই পথে। এরাজ্যের মুসলমান সমাজের বৃহদংশ এখনও শিক্ষার আলো দেখেনি। এরাজ্যের মুসলমান সমাজের বৃহদংশ সরকারি চাকরির সুযোগ পায়নি। এরাজ্যের বৃহদংশ মুসলমান এখনও পুষ্টির অভাবে রোগগ্রস্ত। অথচ জন্মসংখ্যার নিরিখে এদের গতিপথ অবাধ ও অবারিত। ফলত, রাজ্যে মুসলমান জনসংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়লেও এই সম্প্রদায়ের মানুষ কখনও প্রগতির স্বাদ পায়নি। কোনো সামাজিক সংস্কৃতি এদের মনুষ্যত্বকে উন্নত করতে পারেনি। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতির অভাব এদের জড়বাদী করে তুলেছে। একদিকে সুচিন্তার মননের অভাব, অন্যদিকে দুঃসহ দারিদ্র এরাজ্যের মুসলমান সমাজকে টেনে নিয়ে গেছে জেহাদের পথে।

না, জেহাদ ওই সম্প্রদায়ের উন্নয়নের জন্য নয়। হিন্দু বিরোধী সন্ত্রাস গড়ে তোলবার জন্য। দারিদ্র ও শিক্ষার অভাব এদের মস্তিষ্ককে চালিত করেছে দেশি বিদেশি মৌলবাদী চিন্তার দাসত্বের পথে। ফলে মুসলমান সমাজের সুবিধাবাদী অংশ এদের ব্যবহার করেছে অর্থের বিনিময়ে। দুবেলা দুমুঠো পেট ভরা খাবারের সঙ্গতির বিনিময়ে। এদের শেখানো হয়েছে, জেহাদই বাঁচার একমাত্র পথ, মলজিদ হলো তাদের দুর্গ আর মাদ্রাসা হলো তাদের জ্ঞানপীঠ।

অতএব যা হবার তাই হয়েছে। বছরের পর বছর ভোটবাক্স অটুট রাখতে এরাজ্যের কংগ্রেস, সিপিআইএম-সহ প্রায় সমস্ত বামপন্থী রাজনৈতিক দল এবং আরও বেশি মাত্রায় তৃণমূল কংগ্রেস মুসলমান তোষণের তাস খেলছে। এখনও খেলছে। কখনও পরিণতির কথা ভাবেনি। ভাবেনি, এমন কোনোদিন হতে পারে যেদিন গোটা রাজ্যটাই উড়ে যাবে ভয়াবহ বিস্ফোরণে। পশ্চিমবঙ্গের আকাশ ঢাকবে কালো ধোঁয়ায়। রাজ্যের বাতাস ভরে যাবে বারুদের কটূগন্ধে। সেদিন কিন্তু কোনো ভোটবাক্সই বাঁচাতে পারবে না।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা সাম্প্রতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি ভাববার মতো বিষয় উত্থাপন করেছে। তাঁরা বলেছেন, আলকায়দা গোষ্ঠীর পশ্চিমবঙ্গ মডিউলের সদস্যরা বৃহত্তর আদর্শ হিসেবে ওসামা বিন লাদেনের ঘোষিত দুনিয়াব্যাপী জিহাদ প্রতিষ্ঠার বিষয়টিতে অবশ্যই প্রলুব্ধ হয়েছে। ম্যাক্রো লেভেলের এই ভাবনাচিন্তার মূল কেন্দ্র ছিল মুর্শিদাবাদ। কারণ, মুর্শিদাবাদ প্রধানত মুসলমান প্রধান জেলা এবং মুসলমান ঘরানার উত্তরাধিকার। একসময়ে মুর্শিদাবাদ ছিল বাঙ্গলার রাজধানী। নবাব আলিবর্দি খাঁ ও নবাব সিরাজদৌল্লার আমলের মুসলমান আধিপত্যের ইতিহাস এখনও এরাজ্যের মানুষকে আবেগে ভাসায়। বাসনা জাগায় নবাবি আমলের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ফিরে পেতে। এখানে বহু পরিবার আছে যাঁরা হয়তো রিকশা বা টাঙ্গা চালিয়ে দিন গুজরান করেন কিন্তু নিজেদের সিরাজদৌল্লার বংশধর বলতে লজ্জা পান না। বরং গৌরব বোধ করেন। এও একধরনের আবেগ মথিত

ভাবনা। এদের বিভিন্ন দেশি বিদেশি সংখ্যালঘু জঙ্গিমহল থেকে বোঝানো হয়েছে— এই দারিদ্র, এই উপেক্ষা তাদের প্রাপ্য নয়। নিজেদের অধিকার ফিরে পেতে হলে বিশ্বব্যাপী মুসলমান জনসংখ্যার আধিক্য বাড়াতে হবে। জনশক্তি দিয়ে এলাকার জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করে দিতে হবে। গোটা বিশ্ব হবে মুসলমানদের। প্রচারপত্র বিলি চলছে গোপনে। এর আগে মুর্শিদাবাদেরই ধুলিয়ানে এরকম লিফলেট পাওয়া গিয়েছিল। বুদ্ধগয়া বিস্ফোরণের মূলেও ছিল এই এসআইও। গোয়েন্দারা বলছেন, ধুলিয়ানে নাকি সম্প্রতি বেশ কিছু তালিকা ফতেয়া জারি করা হয়েছে যার শিকার হচ্ছেন গরিব মুসলমান পরিবাররা, বিশেষ করে মেয়েরা। মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীরা। অপরাধের পিছনেই রয়েছে মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষ। ধর্ষণ, খুন, অপহরণ, নারীপাচার, নাবালিকার শ্লীলতাহানি, জোর করে একাধিক বিবাহ করা, জোর করে হিন্দু নারীকে ধর্মান্তরিত করা, ডাকাতি, রাহাজানি, প্রতারণা— সব কিছুই পিছনের মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের হাতের ছোঁয়া। এদের কতজন শাস্তি পায়, আর কতজন পায় না,

কেন পশ্চিমবঙ্গে মুসলমান অপরাধীদের এত আধিপত্য? কেন এ রাজ্য আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের করিডোর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে? কেন এই বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে জিহাদি সন্ত্রাসের দিকে? এবার জবাব চাইতে হবে— পশ্চিমবঙ্গ জিহাদি সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে কাদের স্বার্থে? কার স্বার্থে?

সেদিনই ফিরে আসবে শারিয়া আইন। সেদিনই তাঁরা ফিরে পাবেন প্রকৃত সুখ। এমন সুড়সুড়িও দেওয়া হচ্ছে যে একদিন দুই বাঙ্গলা এক হয়ে যাবে এবং সেদিন বৃহত্তর বাংলাদেশ মুসলমান দেশ হিসেবেই গণ্য হবে। অতএব লক্ষ্য স্থির রাখতে হবে।

এই পশ্চিমবঙ্গের মসজিদে মসজিদে ইমাম ও মৌলবাদী মুসলমান নেতৃত্ব সেই পক্ষেই প্রচার চালাচ্ছে। তারা সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করছেন ব্যাপক হারে। শিক্ষা ও চেতনার অভাবে জড় মস্তিষ্ক মুসলমান নবযুবকরা সেই প্রচারকে লালন করছেন। বিতরণ করছেন। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মে ছড়িয়ে যাচ্ছে হিন্দু-বিদ্বেষ। এক প্রজন্ম থেকে আর এক প্রজন্মের হাতে হাতবদল হচ্ছে ধ্বংসের মানসিকতা, বিস্ফোরণ সাম্প্রদায়িকতা।

অতি সম্প্রতি ধরা পড়া আলকায়দাভুক্ত জঙ্গিদের কাছ থেকে এনআইএ উদ্ধার করেছে স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অব ইন্ডিয়া (এসআইও)-র বেশ কিছু প্রচারপত্র। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, মূলত ছাত্রদের মধ্যে বিষ ছড়ানোর জন্যই এইসব

অথচ বিস্ময়ের ব্যাপার যে, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাবাহিনী যখন এত গোপন খবরাখবর সংগ্রহ করছে এবং দিল্লি থেকে উড়ে এসে পশ্চিমবঙ্গের ঘাঁটিগুলিকে দখলে নিচ্ছে, তখন রাজ্যের গোয়েন্দাদপ্তর বা পুলিশ হাত গুটিয়ে বসে আছে। মুখ্যমন্ত্রী গর্জন করছেন, কেন রাজ্যের পুলিশকে না জানিয়ে এইরকম অপারেশন করা হচ্ছে?

উপায় কী? রাজ্য সরকার যদি তার দায়িত্ব পালন না করে তাহলে কেন্দ্রকে সে দায়িত্ব নিতে হবে। দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে, দেশের নাগরিক নিরাপত্তার কথা না ভেবে শুধুমাত্র ভোটের কথা ভেবে যদি কোনো রাজ্য সরকার চোখবুজে বসে থাকে, তাহলে কি কেন্দ্রও হাত গুটিয়ে বসে থাকবে?

না, থাকবে না। এই সব ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়, রাজ্য সরকার ঠিক কী চাইছে? কোন ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রূপায়ণের পথে হাঁটছে রাজ্য সরকার? কেন রাজ্য এবং রাজ্যবাসীকে নিয়ে মৃত্যুর সঙ্গে খেলা করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী? রাজ্যের গত ১০ বছরের সমস্ত অপরাধজনিত ঘটনার হিসাব মেলালে দেখা যাবে ৯০ শতাংশ

সে হিসাব মেলানো দুষ্কর। কিন্তু প্রশ্ন হলো— বাড়াবাড়িরও তো একটা সীমা আছে? সরকারের চোখ বুজে আয়েস করে বসে পান চিবোনরও একটা সীমা আছে? ভাই-ভাইপোদের পাইয়ে দেবার রাজনীতিটাও তো কোথাও একটা থামবে? হিন্দু জনগণের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উতপ্ত করে তোলার চক্রান্ত তো আর চলতে দেওয়া যাবে না। মুর্শিদাবাদের ঘটনা মানুষের চোখ খুলে দিয়েছে। এবার রাজ্য সরকারকে জবাব দিতে হবে— কেন এরাজ্যে মুসলমান অপরাধীদের এত আধিপত্য? কেন এ রাজ্য আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের করিডোর হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে? কেন এই বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষদের ঠেলে দেওয়া হচ্ছে জিহাদি সন্ত্রাসের দিকে? প্রশ্ন করার দিন এসে গেছে। আর দেরি নয়। এবার জবাব চাইতে হবে— পশ্চিমবঙ্গ জিহাদি সন্ত্রাসের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠছে কাদের স্বার্থে? কার স্বার্থে?

মুখ্যমন্ত্রী জবাব দিন। মুখোশটাকে খুলে পাশে রাখুন। অন্ধকারকে তাড়ান। আলো ফেরান। তাতে সবার মঙ্গল। আপনারও, আপামর রাজ্যবাসীরও। ■

পশ্চিমবঙ্গ আজ জেহাদিদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত

মণীন্দ্র নাথ সাহা

হাড়হিম করা খবর। ইসলামি ভারতের চক্রান্ত ফাঁস। ভারত-সহ গোটা উপমহাদেশে ইসলামি শাসনতন্ত্র অর্থাৎ খেলাফত কায়েম করতে চায় আলকায়দা। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ ও কেরল দু' জায়গা থেকে ৯ জন আলকায়দা জঙ্গি ধরা পড়ার পর এই বিস্ফোরক তথ্য হাতে এসেছে গোয়েন্দাদের। তাঁরা জানতে পেরেছেন, ইসলামি ভারতের লক্ষ্যে ছোটো ছোটো মডিউল তৈরি করে লোনউলফ অর্থাৎ আত্মঘাতী হামলার চক্রান্ত করছে আলকায়দা জঙ্গিরা।

মুর্শিদাবাদ থেকে যাদের ধরা হয়েছে তারা হলো নজমুল সাকিব, আবু সুফিয়ান, মইনুল মণ্ডল, লেউ ইয়ান আহমেদ, আল মাসুদ কামাল ও আতিউর রহমান। কেরলের এর্নাকুলাম থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে— মুরশিদ হাসান, ইয়াকুব বিশ্বাস ও মোশারফ হোসেনকে। ধৃতদের কাছ থেকে জেহাদি বইপত্র থেকে শুরু করে বিস্ফোরক, ধারাল অস্ত্র, আইইডি, বডি আরমার অর্থাৎ চালের মতো জিনিসপত্র উদ্ধার হয়েছে। ধৃত জঙ্গিরা প্রত্যেকেউ মুর্শিদাবাদের নাগরিক। আরও জানা গেছে আলকায়দা জঙ্গি আবু সুফিয়ান মোল্লার রানিনগরের বাড়িতে গুপ্ত সুড়ঙ্গের দেখা মিলেছে। সুড়ঙ্গ কীসের জন্য ব্যবহার করত ওই জঙ্গি, তা তদন্ত করে দেখছেন, এনআইএ গোয়েন্দারা।

জঙ্গি ধরা পড়ার পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা থেকে গ্রামগঞ্জের সাধারণ মানুষেরা বিভিন্ন রকম মন্তব্য করছেন। কেউ বলছেন, পশ্চিমবঙ্গ এখন উগ্রপন্থীদের আঁতুড়ঘর, কেউ বলছেন, পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলকে বাঁচাতে পুলিশ সদা ব্যস্ত, জঙ্গি নেটওয়ার্ক খোঁজার সময় কোথায়? ন্যূনতম গোয়েন্দা পরিকাঠামো কাজ করলে পশ্চিমবঙ্গে এই ধরনের কার্যকলাপ চলতে পারত না। কেউ বলছেন, ভোটের জন্যই জঙ্গিদের মদত দিচ্ছে দিদির সরকার।

জঙ্গি ধরা পড়ার খবরে সমগ্র রাজ্য যখন আতঙ্কিত, সেই সময় নিজের অযোগ্যতা ও ব্যর্থতা ধামাচাপা দিতে এনআইএ-র পূর্বাঞ্চলীয় কর্তাকে রাজ্যের ডিজি চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন— রাজ্যকে না জানিয়ে কেন মুর্শিদাবাদের ডোমকলে 'সিক্রেট মিশন' করল এনআইএ। কেনই বা ৬ জনকে গ্রেপ্তারের পর পুরো বিষয়টি জানতে পারে রাজ্য প্রশাসন? ডিজি সাহেবের এনআইএ-কে প্রশ্নের ব্যাপারে স্বভাবতই রাজ্যের পাঁচ পাবলিকও ডিজি-র কাছে জানতে চান— রাজ্যের সাধারণ নাগরিকের জীবন বিপন্ন করে জঙ্গি উৎপাত বাড়তে দেওয়ার অধিকার তার আছে কিনা। রাজ্যের পুলিশ বিভাগের প্রধানের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করে থেকেও তাঁর বাহিনী কেন জঙ্গিদের ঘাঁটির খবর পায় না, কেন জঙ্গির বাড়িতে পাকা সুড়ঙ্গ তৈরি করা হয়, জঙ্গির বাড়িতেই অস্ত্রাগার গড়ে উঠলেও রাজ্যের গোয়েন্দারা সে খবর ডিজি সাহেবকে জানাতে পারে না, না জানাতে চায় না— তার কৈফিয়ত ডিজি সাহেবকেই দিতে হবে। ডিজি-র কাজ যেমন শাসকের চাটুকারিতা করা নয় তেমনি কেন্দ্রীয় সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ করাও নয়। ডিজি যদি নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করে তাঁর বাহিনী দিয়ে রাজ্যের আনাচে-কানাচে গড়ে ওঠা জঙ্গি ঘাঁটি গুঁড়িয়ে দিয়ে জঙ্গিদের তৎপরতা বন্ধ করতে পারতেন তাহলে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে এ রাজ্যে জঙ্গি ধরতে আসার কোনো দরকারই পড়ত না। এনআইএ-র কাছে ডিজি সাহেবের প্রশ্ন প্রমাণ করে তিনি দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ। ডিজি সাহেবের হয়তো জানা নেই যে, দেশের জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা হিসেবে সিবিআই বা ইডি-র মতো সারাদেশের যে কোনো ঘটনা বা মামলার তদন্তভার হাতে নেওয়ার অধিকার আছে এনআইএ-র। কাজেই ডিজি সাহেব ঘুমিয়ে থাকলেও এনআইএ ঘুমিয়ে থাকতে পারে না।

বর্তমানে এরাজ্যে পুলিশের প্রধান কাজ হলো, বিরোধী তথা বিজেপি দলের কোনো রাজনৈতিক কর্মসূচিকে বানচাল করে দেওয়া, বিনা অপরাধে বিজেপি দলের কর্মীদের গ্রেপ্তার করা, শাসকের সমর্থিত গুন্ডারা বিজেপি কর্মীদের মেরে গাছে ঝুলিয়ে দিলে গুন্ডাদের ধরতে না পারা, বিজেপির ঘোষিত কর্মসূচির মঞ্চ ভেঙে দেওয়া নয়ত অনুমতি না দেওয়া, বিদ্যালয়ে শিক্ষক নিয়োগের দাবি আন্দোলনে নিরস্ত্র প্রতিবাদীকে গুলি করে হত্যা করা, বিদ্যালয়ে সরস্বতী পূজা বন্ধের প্রতিবাদে ১২-১৩ বছরের কিশোর-কিশোরীদের মাথা ফাটিয়ে রক্তাক্ত করে দেওয়া প্রভৃতি কাজগুলিকে পুলিশ প্রাধান্য দিয়ে থাকে। অথচ শাসকদলের নেতা-কর্মীরা এবং সন্ত্রাসীরা রাজ্যজুড়ে যা খুশি তাই করে বেড়ালেও পুলিশ ধরা তো দূরের কথা চোখে তা দেখতেই পায় না।

এই রাজ্য আন্তর্জাতিক স্তরের জঙ্গিদের আনাগোনা এই প্রথম নয়। বামফ্রন্টের আমল থেকেই তা শুরু হলেও বর্তমান শাসকদলের ক্ষমতাদখলের পর থেকে তা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। মুখ্যমন্ত্রী দিল্লির গোয়েন্দা কর্তার নিষেধ সত্ত্বেও 'সিমির' মতো নিষিদ্ধ সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হাসান ইমরানের মতো সন্ত্রাসবাদীকে যেদিন এরাজ্য থেকে রাজ্যসভার সাংসদ করে পাঠালেন সেদিনই আন্তর্জাতিক জঙ্গিরা বুঝে গিয়েছিল মাননীয়ার আমলে পশ্চিমবঙ্গ তাদের একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল। তাঁর আমলেই রাজ্যের খাগড়াগড় কাণ্ড, ক্যানিং, ধুলাগড়, কালিয়াচক এবং আরও বিভিন্ন জায়গায় জঙ্গি কার্যকলাপ চললেও রাজ্যের পুলিশ বা প্রশাসনের যথেষ্ট প্রয়োজনীয় তৎপরতা চোখে পড়েনি। বোমা বিস্ফোরণ, আগ্নেয়াস্ত্র তৈরির কারখানার হদিশ মেলা প্রমাণ করে পশ্চিমবঙ্গ আজ বারুদের স্তূপের উপর রয়েছে। যে কোনো সময় বড়োসড়ো বিপর্যয় ঘটে যেতে পারে।

এবারের ৯ জন জঙ্গি ধরা পড়ার পর রাজ্যবাসী ভীত, আতঙ্কিত ও সন্ত্রস্ত। রাজ্যবাসী ডিজি সাহেবের কাছে দাবি জানাচ্ছে যে তিনি যেন চাটুকারিতা ত্যাগ করে জঙ্গিদের ডেরা খুঁজে বের করে পশ্চিমবঙ্গকে জঙ্গিমুক্ত করার কাজে মনোনিবেশ করেন। কেন্দ্রীয় সংস্থার দিকে আঙুল তুলে আহ্লাদপনা না দেখিয়ে তাঁর নিজের দায়িত্ব পালন করা বিশেষ জরুরি বলেই রাজ্যবাসী মনে করেন। ■

ভারতের সাধারণ মানুষ ও নরেন্দ্র মোদী

একবিংশ শতাব্দীতে সাধারণ ভারতীয়দের কাছে নরেন্দ্র মোদী শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়, তিনি এক প্রতিষ্ঠান, যিনি নতুন ভারতের রূপকার, যাঁর নেতৃত্বে ভারতের আর্থ-সামাজিক তথা ভূ-রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটছে।

ড. সুজিৎ রায়

ভারতের কোন প্রধানমন্ত্রী 'স্বাধীন ভারতে' জন্মগ্রহণ করেছেন? উত্তর একটাই : নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। 'সাধারণতান্ত্রিক' ভারতের যাত্রা শুরুর বছরই ১৯৫০ সালে গুজরাটের ভাদনগর থেকে যার এক 'সাধারণ' জীবনযাত্রা শুরু হয়েছিল, আজ ৭০ বছরে তিনি এক 'ফেনোমেনন' — এক সাধারণের 'অসাধারণ' হয়ে ওঠার মূর্ত প্রতীক। তিনি আজ সাধারণ মানুষের কাছে সনাতন ভারতের ঐতিহ্যবাহী এক 'রাজর্ষি'!

২০১৯-এর লোকসভা নির্বাচনে মোদীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকারের লড়াই ছিল ক্ষমতা ধরে রাখার লড়াই। এখানেই প্রশ্ন, 'সাধারণ ভোটার' কী ভেবে,কী অঙ্ক কষে, কী লাভ-ক্ষতির হিসাবে নরেন্দ্র মোদীর সরকারকে পুনরায় বিপুল ভোটে ফিরিয়ে নিয়ে এল? আরও গভীর প্রশ্ন, সাধারণ ভারতীয়রা নরেন্দ্র মোদীকে কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করেন?

প্রথমেই বলা দরকার, সাধারণ মানুষ কিন্তু কোনো এক শিলীভূত মনোলিথিক ধারণা নয়। এক সাধারণ মানুষের মধ্যেই অনেক ধরনের খণ্ড পরিচয়সত্তা অন্তর্লীন হয়ে আছে। এইসব নিয়েই প্রতিটি সাধারণ মানুষ অনেক ধরনের খণ্ড পরিচয়সত্তার এক মিশ্রিত অখণ্ড সত্তাবিশেষ। সেখানেই প্রশ্ন, এক সাধারণ ভারতীয় পছন্দ করার সময় বিভিন্ন খণ্ড পরিচয়সত্তার সাপেক্ষে 'ব্যক্তি' নরেন্দ্র মোদীকে কীভাবে বিচার করেন?

এখানেই একটা প্রশ্ন ওঠে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মানুষ কি সমস্ত পরিবেশ-পরিস্থিতি, সব কারণ, ফ্যাক্টরগুলোকে বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে বা সুযোগ পায়? আবার, নেতা বা প্রতিনিধি নির্বাচনের সময় নেতার নেতৃত্বক্ষমতাকে কীভাবে দেখেন?

সমাজতত্ত্ব শাস্ত্রের অন্যতম প্রধান প্রবক্তা ম্যাক্স ওয়েবার রাজনৈতিক নেতৃত্বের সফলতার ক্ষেত্রে তিন ধরনের ভিত্তির (Ideal types of political leadership) কথা বলেছেন : আকর্ষণীয়/ক্যারিশমা- ভিত্তিক নেতৃত্ব, ঐতিহ্য/ট্রাডিশন-ভিত্তিক নেতৃত্ব ও আইন-ভিত্তিক নেতৃত্ব।

কিন্তু ঘটনা হলো, নরেন্দ্র মোদীর ক্ষেত্রে কোনো একটি ভিত্তি নয়, বরং তিনটি ভিত্তিই সমানভাবে প্রযোজ্য। তার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব, তার সনাতন ভারতীয় ঐতিহ্য-সংপৃক্ততা ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ- ভিত্তিক আইনি ক্ষমতা-প্রয়োগের সামর্থ্য— এই তিনের অদ্ভুত মিশেল সাধারণ ভারতীয়দের কাছে নরেন্দ্র

মোদীকে করে তুলেছে এক অনন্য- সাধারণ জাতীয় নেতা। তারই প্রতিফলন ঘটেছে গত বছরের জাতীয় নির্বাচনে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন, একজন সাধারণ ভোটার কি শুধু আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের কারণেই সেই ব্যক্তির দলকে ভোট দেয়? এখানেই নোবেলজয়ী অর্থশাস্ত্রবিদ তথা মনস্তত্ত্ববিদ হারবার্ট সিমোনের তত্ত্ব প্রাসঙ্গিক। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে তিনি 'সীমাবদ্ধ যৌক্তিকতা তত্ত্ব'— Bounded Rationality Theory এবং 'সন্তোষকারক তত্ত্ব'— Satisfysing Theory অবতারণা করেছেন। অর্থাৎ মানুষ কোনো ক্ষেত্রেই কোনো সময়েই কোনো বিষয়েই সব ধরনের কারণ/ফ্যাক্টর জানতে পারে না। তাই পুরোপুরি যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু এই সীমাবদ্ধতার মধ্যেই 'সন্তোষকারক সিদ্ধান্ত' নেয়। আবার, আরেক বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ আব্রাহাম মাসলোর 'প্রয়োজনের হায়ারার্কি তত্ত্ব'— Need Hierarchy Theory সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ভোটারের মানসিকতা বুঝতে সাহায্য করে। এই তত্ত্বানুযায়ী, মানুষের বিভিন্ন ধরনের প্রয়োজনের পিরামিড-ভিত্তিক পিরামিড-ভিত্তিক কাঠামোর বেস/সর্বনিম্ন স্তরে আছে মানুষের জৈব চাহিদা পূরণের প্রয়োজন। তারপর ধাপে ধাপে অন্যান্য প্রয়োজন— পূরণের চাহিদা, সুরক্ষার চাহিদা, সামাজিক সম্পর্ক স্থাপনের চাহিদা, সম্মানলাভের চাহিদা, শেষে আত্ম-তুষ্টিকরণ বা 'সেলফ- অ্যাকচুয়ালাইজেশন' যেখানে মানুষের বাইরের কোনো চাহিদা পূরণের আকাঙ্ক্ষা নেই। এর সঙ্গেই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের পুশ ও পুল ফ্যাক্টর কাজ করে। পুশ ফ্যাক্টর হলো সেই সব ফ্যাক্টর যেগুলো একজন মানুষকে আগের পছন্দগুলো থেকে সরিয়ে দেয়। পুল ফ্যাক্টর মানুষকে নতুন পছন্দগুলোর দিকে নিয়ে যায়।

এই চার ধরনের প্যারাডাইম তথা প্রেক্ষাপটে--- নেতৃত্ব ক্ষমতা, সীমাবদ্ধ যৌক্তিকতা ও সন্তোষকারকতা, বিভিন্ন স্তরের চাহিদা পূরণ এবং পুশ-পুল ফ্যাক্টর— এইসব নিয়েই একটা 'পারসেপশন' গড়ে ওঠে যা মোটামুটি একজন সাধারণ মানুষকে ভোটের সময় সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রভাবিত করে। সাধারণ ভারতীয়রা নরেন্দ্র মোদীজীর মধ্যে তাদের সমস্ত ধরনের প্যারাডাইমের মেলবন্ধনকে খুঁজে পেয়েছে। এবার সেই আলোচনা।

জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয়তাবোধ, ভারতীয় জাতিসত্তা--- এসবের ক্ষেত্রে মোদীজীর সদর্থক ভূমিকা পুল-ফ্যাক্টর হিসেবে কাজ করছে। উরি, বালাকোট থেকে জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে ইতিবাচক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে, তাই এখন ভারত-চীন সীমান্ত-সংঘর্ষে প্রতিফলিত হচ্ছে। চীনের 'সালামি স্লাইসিং' পলিসি ভারতীয় প্রতিরোধের মুখে পড়েছে। জাতীয় স্বার্থে মোদীজীর অথরাইটেটিভ নেতৃত্বদানের ক্ষমতাতে সাধারণ ভারতীয়দের পূর্ণ আস্থা আছে। সাধারণ মানুষের মৌলিক

চাহিদাপূরণের ক্ষেত্রে মোদীজীর উদ্যোগ কেমন? ২০১৪ নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পরে মোদীজী সাধারণ মানুষকে এক অবাক-করা আর্থিক প্রকল্প উপহার দিয়েছিলেন— জনধন যোজনা, সঙ্গে বিমা প্রকল্প। সাধারণ মানুষ সার্বিকভাবে এই প্রথম ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হলো। তারপর, বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্প চালু হলো, যা সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত— খাদ্য, শৌচালয়, বাড়ি, বিদ্যুৎ, জল, রাস্তা, গ্যাস, স্বনিযুক্তি কর্মপ্রকল্পের জন্য ঋণ ব্যবস্থা ইত্যাদি। এর সঙ্গে আধার প্রকল্পের মাধ্যমে সরকারি সাহায্য সরাসরি অ্যাকাউন্টে ঢোকা, তার সঙ্গে কৃষককে সরাসরি অর্থ সাহায্য, কৃষক-শ্রমিকদের জন্য পেনশন প্রকল্প। এছাড়া বর্তমানে চালু আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্প সাধারণ ভারতীয়দের স্বাস্থ্য-বিমায় এক দিক-নির্দেশক প্রকল্প। এছাড়া, সামাজিক মাধ্যমকে মোদীজী সাধারণ মানুষের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে কাজে লাগিয়েছেন। এ সবই পুল ফ্যাক্টর। নোটবন্দি ও জিএসটি— দুই ক্ষেত্রেই নরেন্দ্র মোদী সরাসরি দায়িত্ব নিয়েছেন। তার সদর্থক দুর্নীতিমুক্ত সরকার চালানোর ইচ্ছা তথা ক্ষমতা ও রাজর্ষিসুলভ ব্যক্তিগত জীবনযাপন— সাধারণ ভারতীয়দের কাছে এক আদর্শ। আজকের সমাজে সেলফ-অ্যাকচুয়ালাইজেশনের প্রতিমূর্তি হলেন নরেন্দ্র মোদী, যিনি সনাতন ভারতের স্বরূপবিশেষ রূপে সাধারণ ভারতীয়দের কাছে প্রতীয়মান হয়েছেন।

এবার পুশ-ফ্যাক্টরের ভূমিকা। যখনই পছন্দের কথা আসে, তখনই সাধারণের মনে আসে প্রথম প্রশ্ন, বিকল্প কে? সত্যিই সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এক সাধারণ ভারতীয় এমন কোনো বিকল্প নেতা পায়নি, যার বিশ্বাসযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা মোদীজীর থেকে বেশি। এর সঙ্গে অন্য পুশ ফ্যাক্টর হলো, ব্যক্তি নরেন্দ্র মোদীর বিরোধিতা করা ও তাঁকে অনবরত ব্যক্তি-আক্রমণ করা, যা সনাতন ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপন্থী।

সব মিলিয়ে একবিংশ শতাব্দীতে সাধারণ ভারতীয়দের কাছে নরেন্দ্র মোদী শুধুমাত্র রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নয়, তিনি এক প্রতিষ্ঠান, যিনি নতুন ভারতের রূপকার, যাঁর নেতৃত্বে ভারতের আর্থ-সামাজিক তথা ভূ-রাজনৈতিক পুনরুজ্জীবন ঘটছে। ■

বিনীতার জন্যই পৈতৃক সম্পত্তিতে বঞ্চিত মেয়েদেরও সমানাধিকার

ধর্মানন্দ দেব

নিবন্ধটির শিরোনাম ইতিমধ্যে আমাদের সবার একপ্রকার জানা হয়ে গেছে। কিন্তু অনেকেই আমরা জানি না বিনীতার পরিচয়। তাই প্রথমেই জেনে নেই বিনীতার পরিচয়। দিল্লি নিবাসী দেবদত্ত শর্মা সরকারি চাকুরি করতেন। তিন ছেলে যথাক্রমে শৈলেন্দ্র শর্মা, রাকেশ শর্মা ও সত্যেন্দ্র শর্মা এবং এক মেয়ে ছিল যার নাম বিনীতা শর্মা। এছাড়াও দেবদত্ত শর্মার স্ত্রীর নাম ছিলেন রামেশ্বরী শর্মা। দেবদত্ত শর্মা সরকারি চাকুরির সুবাদে সরকারি আবাসনে থাকতেন ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত। চাকুরি থেকে উপার্জিত টাকা থেকে তিনি দিল্লিতে ২২৫০ স্কোয়ার ফুটের একটুকরো জমি ক্রয় করেন DLF Housing and Construction Ltd.-এর কাছ থেকে এবং ১৯৬৪-৬৫ সালে ওই জায়গার উপর দেবদত্ত শর্মা আড়াই তলার একটি বাড়ি তৈরি করেন। তারপর চাকুরি থেকে অবসর নিয়ে ওই আড়াই তলার বাড়ির প্রথম তলায় তিনি সপরিবারে থাকতে শুরু করেন। বাড়ির বাকি অংশ ভাড়া দিয়ে দেন দেবদত্ত শর্মা। নীচে ব্যাঙ্ক অব বরোদাকে ভাড়া দেন। পরে একসময় দেবদত্ত শর্মা ব্যাঙ্ক অব বরোদাকে উচ্ছেদের জন্য মামলাও করেন।

১৯৮০ সালে দেবদত্ত শর্মা পরিবার নিয়ে প্রথম তলা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে আসেন এবং গ্রাউন্ড ফ্লোরেই থাকতে শুরু করেন। দেবদত্ত শর্মার একমাত্র মেয়ে বিনীতার বিয়ে হয় ১৯৮১ সালের ১৮ জানুয়ারি। ওই বিয়েতে পিতা ও দুই দাদা মিলে খরচ করেন মোট প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ১৯৯৯ সালের ১১ ডিসেম্বর তিনি মারা যান। তিনি মারা যাওয়ার পর ২০০১ সালের ১ জুলাই বড়ো ছেলে ড. শৈলেন্দ্র শর্মা মারা যায়। তিনি অবিবাহিত ছিলেন। তখন বিনীতা শর্মা পৈতৃক সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ দাবি করেন । প্রায় দুই তিন মাস অপেক্ষা করে যখন মা ও দুই দাদার নিকট থেকে সম্পত্তির ভাগ পেলেন না , তখন বিনীতা ২০০১ সালের ১৭ অক্টোবর আইনজীবী মারফত আইনি নোটিশ প্রদান করেন । বিনীতার মা ও দুই দাদা ২০০১ সালের ১৩ নভেম্বর ওই আইনি নোটিশের উত্তর প্রদান করে জানান যে দাবি করা পৈতৃক সম্পত্তি DLF Housing and Construction Ltd.-এর এবং পিতা দেবদত্ত শর্মা তাদেরকে একটি উইল পত্র (সংকল্প পত্র) প্রদান করে গেছেন। তারা আরও জানান যে ওই সংকল্প পত্র এখন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আরও বলেন এটা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সম্পত্তি। বিনীতা শর্মা তাদের কথা বিশ্বাস করেনি এবং উত্তরের সন্তুষ্ট হতে পারেনি। বিনীতার মতে ওই সম্পত্তি DLF Housing and Construction Ltd.-এর নয় এবং পিতা জীবিতাবস্থায় কোনো সংকল্প পত্র করে যাননি। বিনীতা আরও মনে করেন এই সম্পত্তি অবিভক্ত নয়, বাবা মারা যাওয়ার পর ২০০১ সালের ২১ জুলাই আলাপ আলোচনার মাধ্যমে সম্পত্তি কিছুটা ভাগ করা হয়েছে।

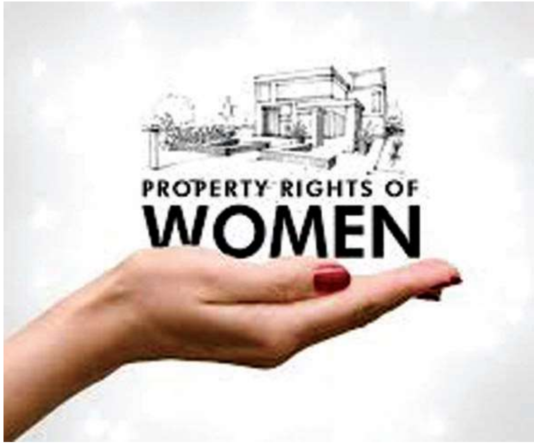

তাই অগত্যা ২০০২ সালে বিনীতা শর্মা দিল্লি হাইকোর্টে মামলা করেন। মামলা নম্বর CS (OS) 267/2002। উল্লেখ্য ওই মামলা দিল্লি হাইকোর্টে চলাকালীন ২০০৫ সালে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সংশোধন হয়। সংশোধনীর পূর্বে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমানাধিকার দেওয়া হয়নি। এরপর প্রায় ৫০ বছর পর ২০০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ওই আইনকে সংশোধন করে ছেলেদের মতো মেয়েদেরও পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। এই সংশোধনীর ফলে জন্মগ্রহণকারী কন্যাকে ‘কোপারসেনার’ মর্যাদা দেওয়া হয়। কোপারসেনার এমন এক ব্যক্তি যার পিতা-মাতার সম্পত্তির জন্মগত অধিকার রয়েছে। কিন্তু বিনীতার করা মামলাটি ২০০২ সালের, তাই প্রশ্ন ওঠে ২০০৫ সালের সংশোধনী কি বিনীতার মামলার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য? প্রায় এক দশকের বেশি মামলা চলে দিল্লি হাইকোর্টে। পরে ২০১৩ সালের ২৯ অক্টোবর বিচারপতি এমএল মেহেতা ১৯ পৃষ্ঠার এক রায় প্রদান করে জানান পিতার সম্পত্তিতে মেয়ের পূর্ণ অধিকার রয়েছে। বিনীতার মা ও দাদারা আপিল করে বসেন ওই রায়ের বিরুদ্ধে। আপিল কোর্ট নথির অভাবের জন্য ফের নিম্ন আদালতে পাঠিয়ে দেয় মামলাটি।

অবশেষে ২০১৬ সালের ২৪ নভেম্বর বিনীতার মামলা খারিজ করে দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। কারণ মেয়ে নাকি এজমালি সম্পত্তির অংশীদার/শরিক (কোপারসেনার) নয়। ২০১৭ সালে আবার হয় আপিল দিল্লি হাইকোর্টে। যার নম্বর RFA 301/2017। ২০১৮ সালের ১৫ মে বিনীতার মামলা খারিজ করে দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। বিচারপতি প্রতিভা, এম সিংহ ২১ পৃষ্ঠার রায় প্রদান করে জানান যে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনের ২৩ নম্বর ধারা অনুসারে মেয়ের ওই বাড়ির ভাগ চাওয়ার কোনো অধিকার নেই। ২০০৫ সালের যে সংশোধন করা হয়েছে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনও বিনীতার মামলায় প্রযোজ্য হবে না বলে জানান। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের

ওই সংশোধনীর ৬ নম্বর ধারায় মহিলাদের পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু দিল্লি হাইকোর্ট বলেছিল যে আইন কার্যকর হওয়ার আগে বাবা মারা গেলে মেয়ে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার পাবে না। বিনীতার বাবা মারা যান ১৯৯৯ সালে। তাই তিনি এই নতুন সংশোধনীর সুফল পেতে পারেন না। দিল্লি হাইকোর্ট ওই রায়ের ২৬ নম্বর প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট জানায় :

"...the Plaintiff (Vineeta Sharma) is not covered by the Proviso to Section 23 and is thus not entitled to a right of residence. The Plaintiff is not even praying for a right of residence. The Plaintiff admittedly has two brothers and her mother who are all living in the suit property. The same thus constitutes a 'dwelling house'. The amendments of 2005 do not benefit the Plaintiff as the father of thePlaintiff passed away on 11th December, 1999....।"

এবার বিনীতা গেলেন দেশের সর্বোচ্চ আদালতে অর্থাৎ সুপ্রিমকোর্টে। দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ২০১৫ সাল থেকে একই প্রশ্নে মামলা হয়। ওইসব মামলাগুলিকে একসঙ্গে করে বিনীতা শর্মার মামলার শুনানি সুপ্রিমকোর্টে চলছিল। মামলা নম্বর ছিল CIVIL APPEAL No. DIARY NO. 32601 OF 2018। ২০১৮ সালের ৫ ডিসেম্বর বিনীতার মামলায় এক নির্দেশ প্রদান করে বিচারপতি এ কে সিক্রি, এ ভূষণ এবং এস আব্দুল নাজির স্পষ্ট জানান : "There is a conflict of opinion in two Division Bench Judgements of this Court i.e. Prakash vs. Phulavati, (2016) 2 SCC 36 and Danamma @ Suman Surpur vs. Amar, (2018) 3 SCC 343 with regard to interpretation of Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956 as amended by Hindu Succession (Amendment) Act of 2005."

অতএব তার সমাধান চাই। তাই প্রয়োজন তিন বিচারপতির বেঞ্চ। যদিও এটি ছিল তিন বিচারপতির বেঞ্চ। কিন্তু ২০১৩ সালের সুপ্রিমকোর্টের রুলসের Order VI Rule 2 অনুসারে সুপ্রিমকোর্টের মুখ্যবিচারপতি প্রয়োজনীয় বেঞ্চ তৈরি করে দেবেন এই ধরনের আইনি জটিলতার জন্য। তাই বিষয়টি মুখ্যবিচারপতির কাছে পাঠান যথাযথ বেঞ্চ গঠনের জন্য। পরে সুপ্রিমকোর্টের মুখ্য বিচারপতি নতুন বেঞ্চ গঠন করে দেন বিচারপতি অরুণ মিশ্র, এস আব্দুল নাজির এবং এম আর শাহ-কে নিয়ে। দীর্ঘ শুনানি শেষে গত ১১ আগস্ট ২০২০-তে সুপ্রিমকোর্টের ওই নতুন বেঞ্চ ১২১ পৃষ্ঠার ও ১৩০ প্যারাগ্রাফের দীর্ঘ রায়ে বিনীতা শর্মার মামলায় জানান অবিভক্ত যৌথ পরিবারের সম্পত্তিতে মেয়েদের সারাজীবন সমান অধিকার রয়েছে। কন্যা মানে সারাজীবনই কন্যা। পুত্র সন্তান ততদিন পুত্র থাকে, যতদিন না তাঁর বিবাহ হচ্ছে। সুপ্রিমকোর্ট স্পষ্ট জানায় :

"Daughters must be given equal rights as sons, Daughter remains a loving daughter throughout life. The daughter shall remain a coparcener throughout life, irrespective of whether her father is alive or not."

উল্লেখ্য, ১৯৫৬ সালের পূর্বে সমগ্র দেশের দু' ধরনের স্কুল পাই হিন্দু আইনে। এগুলো হচ্ছে— মিতাক্ষরা স্কুল ও দায়ভাগা স্কুল। মিতাক্ষারা শব্দটি যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি (Yajnavalkya Smriti) নিয়ে বিজ্ঞানেশ্বরা (Vijnaneswara) দ্বারা রচিত একটি ভাষ্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে। অন্যদিকে 'দায়ভাগা' (Dayabhaga) পদ্ধতিটি তৈরি করেন জিমূতবাহনের (Jimutavahana) রচনা থেকে। অসম ও পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া সমগ্র দেশেই মিতাক্ষরা পদ্ধতি চালু রয়েছে। তবে উত্তরপ্রদেশের মিথিলা ও বেনারস, মহারাষ্ট্র ও চেন্নাইয়ে আবার তার মধ্যে ভিন্ন প্রকারভেদ রয়েছে। এখানে পুত্রের জন্মের পর থেকেই সম্পত্তির ওপর অধিকার জন্মায় ও দায়ভাগাতে পিতার মৃত্যুর পর থেকে ছেলের অধিকার হয়। ১৯৫৬ সালের হিন্দুর উত্তরাধিকার আইনে পৈতৃক সম্পত্তিতে মেয়েদের সমানাধিকার দেওয়া হয়নি। প্রায় ৫০ বছর পর ২০০৫ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালের হিন্দুর উত্তরাধিকার আইনে সংশোধন আনা হয়। সংশোধন করে বলা হয় ছেলেদের মতো মেয়েদেরও পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অধিকার রয়েছে। তাহলে যে বিষয় আইনসিদ্ধ সেক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্ট এমনকী ১১ আগস্ট রায় প্রদান করে বিনীতা শর্মার মামলায় যেটা নিয়ে এতো আলোচনা ও সমালোচনা চলছে দেশব্যাপী। আসলে প্রশ্নটা হচ্ছে নতুন সংশোধনীর পূর্বের সময়কালে কি এই নতুন সংশোধনী নিয়ম কার্যকর হবে? অর্থাৎ ধোঁয়াশা দেখা দেয় 'রেট্রোসপেক্টিভ এফেক্ট' নিয়ে। ২০১৬ সালে ফুলবতী মামলায় বলা হয়েছিল ২০০৫ সালে ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে যে সংশোধন করা হয় সেটার 'রেট্রোসপেক্টিভ এফেক্ট' নেই। আবার ২০১৮ সালে দামান্না মামলায় সুপ্রিমকোর্ট বলেছিল 'রেট্রোসপেক্টিভ এফেক্ট' আছে। তাই এই ধোঁয়াশা বেশি করে দেখা দেয় ভারতের মেয়েদের মনে। ১১ আগস্ট সুপ্রিমকোর্ট এই ধোঁয়াশাটাই দূর করে ১২১ পৃষ্ঠার রায়ে। পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত মেয়েদের সম্পত্তির অধিকার ফিরিয়ে আনেন দিল্লির বিনীতা শর্মা। দীর্ঘ ১৮ বছর তিনি আইনি লড়াই চালান। ফলস্বরূপ, নিজের অধিকার ফিরে পান এবং সমগ্র দেশের বঞ্চিতা নারীর অধিকার ফিরিয়ে আনেন। এই অর্থে ১১ আগস্টের রায় ঐতিহাসিক। দেশের বিভিন্ন হাইকোর্ট ও নিম্ন আদালতে এই একই প্রশ্নে অনেক মামলা বিচারাধীন। ওই বিষয়ে সুপ্রিমকোর্ট বিনীতা শর্মার মামলার রায়ের ১৩০ নম্বর প্যারাগ্রাফে স্পষ্ট বলেছে :

"We understand that on this question, suits/appeals are pending before different **High Courts and subordinate Courts.** The matters have already been delayed due to legal imbroglio caused by conflicting decisions. The daughters cannot be deprived of their right of equality conferred upon them be Section 6. Hence, we request that the pending matters be decided, as far as possible, **within six months.** In view of the aforesaid discussion and answer, we overrule the views to the contrary expressed in *Prakash-vs-Phulavati* and *Mangal-vs-T.B. Raju & Ors...*"

পরিশেষে বলব, পৈতৃক সম্পত্তিতে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায় ঐতিহাসিক, কেননা এই রায় দেশের লিঙ্গবৈষম্য দূর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। আমাদের দেশের সংবিধান যেখানে সমতার অধিকার দিয়েছে, সেখানে পুরুষ ও নারীর মধ্যে বৈষম্যের রীতি-নীতির অবসান হওয়ার প্রয়োজন। তাই বিনীতা শর্মার মামলার রায়ে অবসান হলো এই বৈষম্য ও বিতর্কের। ▮

ভারতের রহস্যময়, অজ্ঞাত ও বিশিষ্ট সীমান্ত শক্তি এসএফএফের বীরগাথা

ডাঃ আর এন দাস

যদিও এর সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৬২ সালের ১৪ নভেম্বর। চীন-ভারত যুদ্ধবিরতির ঠিক সাতদিন আগে, চীনাসেনাদের গুপ্তঘাতকদের মোকাবিলা করার জন্য। কিন্তু কখনই এই ভয়ংকর কম্যান্ডোদের চীনের বিরুদ্ধে লাগানো হয়নি। তবে এই মারাত্মক শক্তি বহু যুদ্ধে ভারতীয় সেনাদের বিজয় এনে দিয়েছে। ৩১ আগস্ট, ২০২০, চীনাদের পাতা ১৯৬২ সালের মাইন বিস্ফোরণে বীরগতিপ্রাপ্ত নীমা (তি:সূর্য) তেনজিংকে (তি:বুদ্ধ) শ্রদ্ধাঞ্জলি জানানোর জন্যই এই প্রবন্ধ।

আমেরিকার জনপ্রিয় রাষ্ট্রপতি কেনেডির প্রেরণায় সিআইএ এবং ভারতীয়সেনা, তিব্বত থেকে বিতাড়িত বিদ্রোহী শরণার্থী অকুতোভয় গোর্খাদের নিয়ে দুর্ধর্ষ গ্রিন ব্যারেটের সমতুল্য এই অসমসাহসী মারাত্মক সৈন্যবাহিনীকে বিশেষ উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য প্রশিক্ষিত করেন। অন্যান্য দেশের মতো স্বাধীন ভারতে নিয়মিত সামরিকবাহিনী ব্যতিরেকে এটাই সর্বপ্রথম একটি বিশেষ কম্যান্ডো বাহিনী গঠিত হয়। এই বাহিনীর বিশেষত্ব, এরা মৃত্যুর সঙ্গে খালি হাতে খেলা করে। দুঃসাহসী এই বীরযোদ্ধারা রাত্রে হায়েনার মতো দেখতে পায়, পর্বতমূষিকের মতো উচ্চ শিখরে অবলীলায় পৌঁছে যায়, সিংহ গর্জনে আতঙ্কিত শত্রুর হৃদয় বিদীর্ণ করে, ঝাঁপিয়ে পড়ে খুকরি দিয়ে দুর্বিনীত শত্রুর নাড়িভুঁড়ি বের করে দেয়। ফিল্ড মার্শাল স্যাম মানেক শ'র বিখ্যাত উক্তি : যদি কেউ বলে আমি মরতে ভয় পাই না, হয় সে মিথ্যুক নতুবা একজন গোর্খা!

১৯৫৯-এর তিব্বতীয় অভ্যুত্থানের সময় চৌ এন লাইয়ের নির্দেশে পিএলএ সৈন্যরা ২০ অক্টোবর ১৯৬২ সালে ৩,৩২৫ কিমি দীর্ঘ হিমালয়ের কোলে দুই দেশের মধ্যে অবস্থিত ম্যাকমোহান লাইনকে অগ্রাহ্য করে অতর্কিত আক্রমণে পশ্চিমদিকে চুসুলের রেজাং লা ও পূর্বদিকের তাওয়াং উপত্যকা, আকাসাই চীন-সহ ৪৩ হাজার বর্গকিমি বলপূর্বক দখল করে এবং ভারতীয় চেকপোস্টগুলি ধ্বংস করে। ২০ নভেম্বর একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে দেয়। সেই থেকেই ভারতের সঙ্গে চীনের অবিরাম যুদ্ধ চলছে। ১৪ হাজার ফিট উচ্চের এই দুর্গম রণাঙ্গনে নৌ বা বিমানবাহিনীর কোনো ভূমিকা নেই। সেখানে স্থলসেনাই ভরসা।

চীন ১৯৫০ সালে তিব্বত দখল করলে ১৪তম দলাই লামা গুপ্তহত্যার ষড়যন্ত্রের আঁচ পেয়ে ভারতের রাজনৈতিক আশ্রয়ে হিমাচলের ধর্মশালায় অস্থায়ী তিব্বতীয় সরকার গঠন করেন। সারাবিশ্বে চীনের সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনমত সংগ্রহের জন্য অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়ে যেতে থাকেন। সে সময়ে আমেরিকা ও সোভিয়েত ইউনিয়নের

মধ্যে কিউবা মিসাইল ক্রাইসিস নিয়ে ঠাণ্ডাযুদ্ধ চলছিল।

গত মাসেই ছয় দশক পরে এই প্রথম চীনাসেনার বিরুদ্ধে এসএফএফয়ের কম্যান্ডোদের সাহায্যে লাদাখের দক্ষিণ প্যাঙ্গং সোও, হেলমটে, ব্ল্যাক ও টাইগার টপ, ফিঙ্গার ফোরের ট্যাকটিক্যাল পয়েন্টগুলি ভারতীয় সেনারা দখল করেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর দুই কুর্গী শূরবীর জেনারেল কেএম কারিয়াপ্পা ও তাঁরই আত্মীয় কেএস থিমায়্যার সঙ্গে অনিবার্য কারণেই দূরদৃষ্টিহীন পণ্ডিত নেহরুর সংঘর্ষ বাঁধে। থিমায়্যা (১৯৫৭-১৯৬১) সেনাধ্যক্ষ থাকার সময়ে দলাই লামার দেহরক্ষী ও তিব্বতীয় বিদ্রোহী যুবকদের নিয়ে এক দুঃসাহসী পল্টন তৈরির পরামর্শ দেন। প্রথমে রক্ষাসচিব ভি কে কৃষ্ণমেনন ও নেহরু তা অগ্রাহ্য করলেও ১৯৬২-র যুদ্ধে লজ্জাকর হার ও অরুণাচলে চীনাদের অনুপ্রবেশে উদ্বিগ্ন হয়ে নেহরু শেষমেশ এসএফএফ গঠনের অনুমতি দেন। অবশ্য নেপথ্যে ছিলেন সুরক্ষা সম্বন্ধীয় পরামর্শদাতা তৎকালীন আই.বি প্রধান ভোলানাথ মল্লিক, দলাই লামার জ্যেষ্ঠভ্রাতা গিয়ালো থোনডুপ ও অন্যজন ওড়িশার পাইলট মুখ্যমন্ত্রী বিজু পট্টনায়ক। অহিংসাবাদী নিরীহ তিব্বতীয়দের উপর স্বৈরাচারী চীনের অত্যাচারের কাহিনি পরিচালক মার্টিন স্করসেসের ১৯৯৭ সালের হলিউড সিনেমা 'কুন্দুন' দর্শকের চোখে জল এনে দেয়। বিদ্রোহীনেতা গনপো তাসির নেতৃত্বে ১৯৫০ সালে তিব্বতীয় যুবাদের গেরিলাবাহিনী 'চুসী গাংদ্রুক' মাতৃভূমি উদ্ধারের আশায় ছয় দশক ধরে লড়াই চালাচ্ছিল।

উত্তরাখণ্ডের দেরাদুন থেকে ১০০ কিমি দূরে তিব্বতীয় শরণার্থীদের বাসস্থান চক্রতাতে প্রশিক্ষণ শিবিরের সদর দপ্তর খোলা হয়। তিব্বতের খামপ্রদেশের কষ্টসহিষ্ণু ১২ হাজার বলিষ্ঠ যোদ্ধাকে নিয়ে ১৯৬২-তে তৈরি হয় প্রথম দলটি। সেই সংখ্যা ১৯৭০-এ বিশ হাজারে ও ২০০৯-এ দশ হাজারে নেমেছিল। আমেরিকার এম-১, এম-২ এবং এম-৩ মেশিনগান দিয়েই শুরু হয় গেরিলাযুদ্ধের সূচনা। কিন্তু ১৯৬৩ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনীর মধ্যেই অন্তর্কলহ শুরু হয় এসএফএফ-কে বেশি মর্যাদা দেওয়ার কারণে। শেষে ভারতীয় সেনার গরুড় বাহিনীর সঙ্গে এসএফএফ কম্যান্ডোদের প্রতিযোগিতায় শেষোক্ত বাহিনীর শ্রেষ্ঠতাই প্রমাণিত হয়। ১৯৬৪ সালে আগ্রাতে প্যারাসুট ও বায়ুযুদ্ধের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রও খোলা হয়। '৬০-এর দশকের শেষভাগে ৬টি ব্যাটেলিয়নের সৃষ্টি হয়। প্রতি ব্যাটেলিয়নে ৬টি কোম্পানি, প্রতিটি কোম্পানিতে তিব্বতীয় তুষার সিংহের ব্যাজ পরিহিত ১২৩ জন করে কম্যান্ডো থাকতো। তিব্বতীয় ব্যাটালিয়ন ও কোম্পানি অধ্যক্ষ যথাক্রমে ভারতীয় সেনার লেফটেন্যান্ট কর্নেল ও মেজর র‍্যাঙ্কের সমতুল্য ছিল। বিপ্লবী তিব্বতীয় মহিলাদেরকে মেডিক্যাল ও সিগনাল কোরে রাখা হয়েছিল। মিলিটারি ক্রসে ভূষিত মেজর জেনারেল সুজন সিংহ উব্বানই ছিলেন এসএফএফ বা ২২তম মাউন্টেন এসটাব্লিশমেন্টের জনক। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আফ্রিকার ঊষর মরুতে লংরেঞ্জ স্কোয়াড্রন ও ইউরোপে ২২তম মাউন্টেন রেজিমেন্টের অধিনায়কত্ব করেছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর অফিসের তত্ত্বাবধানে হলেও ভারতীয় সেনাবাহিনীই এর পরিচালনা করতো। এসএফএফ-এর স্পেশাল ৪র্থ বিকাশ ব্যাটেলিয়নে ১২শো দুর্ধর্ষ কম্যান্ডো রয়েছে। ভারতের অভ্যন্তরীণ

কারগিল যুদ্ধে ১৯৯৯ সালে 'অপারেশন বিজয়ে' বলিষ্ঠ অদম্যসাহসী এসএফএফ-এর পরাক্রমে পাকসেনারা পরাস্ত হলে দলাই লামা নিজে এসে এই বাহিনীর কম্যান্ডোদের আশীর্বাদ করেন এবং ভবিষ্যতে কমিউনিস্ট চীনের করাল গ্রাস থেকে তিববতকে মুক্ত করার আহ্বানও জানান।

গোয়েন্দাবিভাগে যেমন আইবি, সিবিআই এবং এনএস-এ আছে, বিদেশে গুপ্তচরবৃত্তির জন্য তেমনই রয়েছে রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিসের সুদক্ষ গোয়েন্দারা। রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালিসিসের নিজস্ব ইউনিটে অতি গোপনীয় মিশনের জন্যে সিআই-এর স্পেশাল একটিভিটি ডিভিসনের সমতুল্য 'দ্য ম্যাভেরিক বা ২২এস.এফ' বাহিনী তৈরি করা হয়েছে ওই এসএফএফ-এর বিশিষ্ট কম্যান্ডোদের দিয়ে। ১৯৮৩ সালে ইজরায়েলে মোসাদের সদরদপ্তর সায়েরেত মাতকলে পাঠানো হয় ছ'জন অফিসারকে বিশেষ প্রশিক্ষণের জন্য।

প্রাথমিক অবস্থায় এদের ৪৪ সপ্তাহের কঠোর প্রশিক্ষণে চীন অধিকৃত তিব্বতে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ, গোপনে শত্রুর উপর অতর্কিত আক্রমণ, প্যারাসুট ঝাঁপ, পাল্টা গোয়েন্দাগিরি, ছদ্মবেশে শত্রুদেশে গুপ্তহত্যা, বিশেষ পরিস্থিতির মোকাবিলা এবং পাহাড়ে চড়ার কম্যান্ডো ট্রেনিং দেওয়া হতো। মনসংযোগ, নিরন্তর সংকটপূর্ণ অবস্থার বিশ্লেষণ ও তাৎক্ষণিক বুদ্ধি-সহ নির্ণায়ক ভূমিকা পালন, পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে নেওয়া, উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য প্রাণের আহুতি এবং বিমান হাইজ্যাকের প্রশিক্ষণও দেওয়া হতো। এছাড়াও আছে এসএফএফ-এর ডেসার্ট স্করপিয়ন নামের ভয়ানক কম্যান্ডো বাহিনী যারা মরুভূমিতে হিংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজে বিশেষ দক্ষ। এই বাহিনীকে অনেক ভয়ংকর পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছে — ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত, ১৯৭১-এ বাংলাদেশ এবং ১৯৯৯ সালের কারগিল যুদ্ধে।

১৯৬৪ সালে ভারতীয় সেনা এবং সিআই-এর এজেন্টরা এদের মাধ্যমেই চীনের আণবিক বোমা ও ব্যালিস্টিক মিসাইল পরীক্ষার প্রমাণ সংগ্রহের জন্য নন্দাদেবী পাহাড়ে নির্দিষ্ট স্থানে অত্যাধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্র-সহ ক্যামেরা লাগিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতো। ১৯৭০ সালে এই বাহিনীর কিছু কম্যান্ডো চীন অধিকৃত তিব্বতের নিয়ন্ত্রণ রেখা অতিক্রম করে চীনা সৈন্যশিবিরে সাফল্যের সঙ্গে অন্তর্ঘাতমূলক কাজ সম্পন্ন করলে চীনা সরকার তীব্র প্রতিবাদ তোলে। ভারত-চীন

সীমান্তে চরম উত্তেজনার সৃষ্ট হলে, দুই দেশের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার লেভেলের আপোশ-মীমাংসায় স্থির হয় ১০ কিমি পর্যন্ত কোনো দেশই সৈন্য সমাবেশ করবে না।

অপারেশন ইগলে ১৯৭১ সালের বাংলাদেশ যুদ্ধে পাকসেনা অধিকৃত চট্টগ্রামের পাহাড়ি অঞ্চলে এই দুর্ধর্ষ বাহিনী পরাক্রমের সঙ্গে সড়ক ও সেতুগুলি ধ্বংস করে। মজুদ অস্ত্রভাণ্ডারে আগুন ধরিয়ে দেয়। পানীয় জল, খাদ্যবাহিত ও অন্যান্য রসদভর্তি সামরিক ট্রাকগুলিকে ধ্বংস করে। হাতাহাতি যুদ্ধে পারদর্শী এই কম্যান্ডোরা পাকিস্তানিদের শিবিরগুলি গুড়িয়ে দেয়। সামরিক পরিকাঠামো ও ট্যাঙ্কগুলিকে অকেজো করে দেওয়ায় পাকিস্তানের পরাজয় সুনিশ্চিত হয়।

সেই যুদ্ধে ৫৬ জন হত ও ১৯০ জন আহত হয়েছিল। নাম গোপন রেখে সরকার ৫৮০ জন কম্যান্ডোকে শৌর্যসম্মানের পরিবর্তে নগদ পুরস্কার দেয়। ছদ্মবেশে রাতের গভীর অন্ধকারে গুপ্ত ও প্রচ্ছন্ন অভিযানে দক্ষ অকুতোভয় এই ভয়ংকর বাহিনীকে 'চট্টগ্রামের অলীক প্রেতাত্মা' বলেই সকলে জানতো। ভারতীয় সেনার ব্রিগেডিয়ারের সমকক্ষ এক তিব্বতীয় ডাপনের নেতৃত্বে বুলগেরীয় এ.কে-৪৭ এবং আমেরিকার কারবাইনধারী বিজয়ী এসএফএফ কম্যান্ডোরা কাপ্টাই বাঁধ ধ্বংস করে পাকসেনার বর্মা পালানোর রাস্তা বন্ধ করে দেয়। সেই যুদ্ধে কামান ও বিমানের অভাবে চট্টগ্রাম দখলটা অপূর্ণই থেকে যায়। ছ'টি ব্যাটালিয়নকে তিনটি কলামে বিভক্ত করে মর্টার ও রিকয়েললেস রাইফেল নিয়ে এয়ারফোর্সের এম.আই-৪ হেলিকপ্টারের সাহায্যে, ১৯৭১ সালের ৩ ডিসেম্বর পাকিস্তানের ৯৭তম ইন্ডিপেন্ডেন্ট ব্রিগেড ও দুটি কম্যান্ডো ব্যাটেলিয়নকে ধ্বংস করার শ্রেয় পেয়েছিল এসএফএফ। সেদিনই জেনারেল নিয়াজির নেতৃত্বে পাকবাহিনী ৯৩ হাজার সৈন্য-সহ আত্মসমর্পণ করে ভারতের জেনারেল জগজিৎ সিংহ অরোরার কাছে।

জনসাধারণের অগোচরে নানা গোপন অপারেশনেই এদের কাজে লাগানো হয়েছে। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে সারসাওয়াতে সাম্প্রদায়িক হামলার প্রতিরোধে সুরক্ষাদলের ডাইরেক্টর জেনারেলের অনুমোদনে ৫০০ জন এসএফএফ কম্যান্ডো দাঙ্গা দমন করে। অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির পরিসর থেকে ১৯৮৪ সালে শিখ উগ্রপন্থীদের বিতাড়িত করার গুরুত্বপূর্ণ কাজও তারাই করে।

গর্বের সঙ্গে স্মরণীয়, ১৯৬২ সালে চীনের অন্যায়ভাবে দখল করা, ২২০০ বর্গকিমি জায়গা জুড়ে এবং ৭৬ কিমি দৈর্ঘ্যের পৃথিবীর সর্বোচ্চ দুর্গম তুষারমণ্ডিত রণক্ষেত্র সিয়াচীন (সিয়া-গোলাপ, সিন-উপত্যকা) হিমবাহটি, ১৯৮৪ সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী ও এসএফএফ-'অপারেশন মেঘদূতের' সাহায্যে পুনরায় উদ্ধার করে। ১৯৮৬ সাল থেকেই পর্বতমূষিকদের একটি দলকে স্থায়ীভাবে সিয়াচীনে রাখা যেখানে শীতকালে তাপমান মাইনাস ৫০ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের নীচে নেমে আসে, বাতাসে অক্সিজেনের চাপও অনেক কমে যায়। চীন ও পাকিস্তান উভয়েরই লোভ এই সিয়াচীনে। সিয়াচীন জয়ের পর থেকেই ভারতীয় সেনার মধ্যে এসএফএফ-এর মর্যাদা বেড়ে যায়। তুষারমণ্ডিত পর্বতযুদ্ধে পারদর্শিতার জন্য এখন বেসক্যাম্পের স্কুলে নিয়মিত প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। সেজন্যই ১৯৮৫ সাল থেকেই ভারতীয় সেনাদের সঙ্গে তাদের সমান পদমর্যাদা দেওয়া হচ্ছে। অকুতোভয় এই কম্যান্ডোদের ১৯৮৯ সালে ভারতের স্থলসেনাদের মতোই ডিপিএম ছদ্মবেশ ধারণের ইউনিফর্ম এবং বডি-আর্মার দেওয়া হয়েছে। মুম্বাই তাজ হোটেল আক্রমণে ২৬ নভেম্বর ২০০৮-এ এই কম্যান্ডোরাই আজমল কাসভকে ধরেছিল।

কারগিল যুদ্ধে ১৯৯৯ সালে 'অপারেশন বিজয়ে' বলিষ্ঠ অদম্যসাহসী এসএফএফ-এর পরাক্রমে পাকসেনারা পরাস্ত হলে দলাই লামা নিজে এসে এই বাহিনীর কম্যান্ডোদের আশীর্বাদ করেন এবং ভবিষ্যতে কমিউনিস্ট চীনের করাল গ্রাস থেকে তিব্বতকে মুক্ত করার আহ্বানও জানান।

অতীতে বিভিন্ন যুদ্ধে এদের বিশেষ অবদানের কথা বিবেচনা করে ভারত সরকার ২০০৯ সালে ভারতীয় সেনাদের সমান বেতন, ভরতুকি, মহার্ঘ্য ভাতা, পেনসন ও অন্যান্য আরও অনেক সুযোগসুবিধা দিয়ে এদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি করে। এঁরা দেশের অভ্যন্তরে নকশাল ও ইসলামি জিহাদিদের অনেক নাশকতামূলক কাজকে গোপনে দমন করেছেন। সেগুলি জনসাধারণের জানার বাইরে রাখা হয়েছে। দেশের মধ্যে দিগ্বিজয় সিংহ, মণিশংকর আইয়ার, কপিল সিব্বাল, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, বরখা দত্ত বা রাজদীপ সারদেশাইয়ের মতো যারা পাকিস্তানের আইএসআই কিংবা চীনের নিয়মিত ও গোপন পে-রোলে আছেন, তাদের বিরুদ্ধেও এইরকম সাইবার এক্সপার্ট কম্যান্ডোর প্রয়োজন আছে বলে লেখকের অভিমত। যেটুকু জনসাধারণের অবগতির জন্য সরকার কর্তৃক প্রকাশিত তথ্য ইন্টারনেটে পাওয়া গেছে, তার উপর ভিত্তি করেই এই প্রবন্ধটি লেখা হয়েছে। গুপ্ত তথ্য গোপনেই থাক। ভারতমাতার বীর জোয়ানরা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে দেশমাতৃকার সেবা করছে।

সেবানিবৃত্ত কম্যান্ডিং অফিসার যাঁরা এই এসএফএফ-কে নেতৃত্ব দিয়েছেন তাঁরা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেছেন, পৃথিবীর অন্যতম অসমসাহসী ও শারীরিক শক্তিসম্পন্ন প্যারাট্রুপাররা হচ্ছেন আমাদের গর্বের এই কম্যান্ডোবাহিনী। চিরাচরিত গোলাগুলির লড়াইয়ের বাইরে ১৯ বছরের গেরিলা বা অনিয়মিত খণ্ডযুদ্ধে পারদর্শী ভিয়েতনামি যোদ্ধারা আমেরিকান সৈন্যদেরও হারিয়ে দিয়েছিল। হলিউডের সিনেমা সিলভেস্টার স্ট্যালনের রাম্বো দেখলে বোঝা যায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কীভাবে এই কম্যান্ডোরা যুদ্ধজয়কে সুনিশ্চিত করে। কম্বোডিয়ার গেরিলা যোদ্ধারা পিএলএ-কে তাড়িয়ে দিয়েছিল দেশ থেকে। শিবাজী মহারাজের ভীল বীরযোদ্ধারা ঔরংজেবের বিশালবাহিনীকে পরাজিত করেছিল অবলীলায়। দ্বাদশ শতাব্দীতে মোঙ্গলিয়দের বিরুদ্ধে জাপানি সামুরাইরাও গেরিলা যুদ্ধ করেছিল। বাঙ্গলার বারোভুঁইয়ার অন্যতম প্রতাপাদিত্যের সরকিওয়ালা ও লেঠেলরা মোগলদের সঙ্গে যুদ্ধে এভাবেই মাতৃভূমিকে বহু শতাব্দী ধরে রক্ষা করে এসেছিল। অহোমরাজের অন্যতম সেনাপতি লাচিৎ বরফুকনের গেরিলা বাহিনীও মোগলদের বিশাল ঘোড়সওয়ার বাহিনীকে তাড়িয়ে ৬০০ বছর উত্তরপূর্ব ভারতকে ইসলামমুক্ত করে রেখেছিল। এই অস্বাভাবিক যুদ্ধে প্রয়োজন অকুতোভয় দুর্ধর্ষ যোদ্ধার। শারীরিক শক্তির থেকে মানসিক শক্তিতে অধিক বলীয়ান হতে হয়। জয় অমর শহিদ নেইমা তেনজিং।

গুজরাটের প্যাটেল ও কলকাতার কার্নিভাল

কুণাল চট্টোপাধ্যায়

আমরা বাঙ্গালিরা অনেকেই ব্যবসা পেশাটিকে সম্মানের চোখে দেখি না। 'রিচ ড্যাড, পুয়োর ড্যাডের' সেই বাবাটির মতো শিক্ষিত বাঙ্গালি বাবারা অনেক ক্ষেত্রেই চান ছেলে-মেয়ে ফিজিক্স পড়ুক। অনেকেই ব্যবসাকে 'বেওসা' বলে ব্যঙ্গ করতে ভালোবাসেন। কাব্য, নাটক, সাহিত্য, সংগীত বা বৈঠকি রাজনীতি এই বাঙ্গালির প্রিয় বিচরণ ক্ষেত্র। অনেকদিন আগে এক অবাঙ্গালি ব্যবসায়ীকে বলতে শুনেছিলাম, If I have money, I can purchase your knowledge, but if you have knowledge you may not earn money। জন্মলগ্ন থেকেই কলকাতার মূলধনী বাজারে এটা কম-বেশি প্রমাণিত। একশো বছর আগে দু'তিন জন সফল উদ্যোগপতিকে বাদ দিলে সফল বাঙ্গালি ব্যবসায়ীকে আজ অনুবীক্ষণে দেখতে হয়। অতীতে ইহুদি, পরে পার্শি, সিন্ধি, গুজরাটি, মাড়োয়ারি ও ইদানীং বিহারিদের বিচরণ এক্ষেত্রে বিলক্ষণ বিদ্যমান। লায়ন্স রেঞ্জ বা বড়বাজার অপেক্ষা কলেজ স্ট্রিট, নন্দন চত্বরই বাঙ্গালির পছন্দের ক্ষেত্র। পোস্ট মর্ডানিজম বা হিন্দু ফ্যাসিবাদ বিরোধিতার সুর বাঙ্গালি কণ্ঠে সর্বদাই চড়া। অভাব বা অনগ্রসরতার কথা উঠলেই এতকাল বাঙ্গালি দেশভাগ, মাশুল সমীকরণের কথা বলত, এখন গুজরাটের দুর্বল সোশ্যাল ইন্ডিকেটারের কথা বলে।

ষাট সত্তরের দশক পর্যন্ত সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রশাসক থেকে বিজ্ঞানী কিংবা অধ্যাপক থেকে বলিউডে দাপুটে কলাকুশলীদের সমাবেশে বাঙ্গলার প্রাধান্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এখন চলছে বিরামহীন পাতা ঝরার ঋতু। অবস্থা কতটা খারাপ হলে মুর্শিদাবাদ থেকে কাশ্মীরে আপেল কুড়োনোর কাজে যেতে হয়। সুদূর অরুণাচল প্রদেশের পরশুরামকুণ্ডের মেলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ ভিক্ষুক মালদার বাঙ্গালি। এই অক্ষমতাই ডেকে আনছে সফল রাজ্যগুলির প্রতি বিরক্তি।

এই ধরনের বিতর্ক নতুন নয়। অতীতেও রঙিন টিভি, পানীয় জলের প্রশ্নে বাঙ্গালিরা সংসদে সরব হয়েছিলেন। মন্দির, হাসপাতাল, প্যারাডক্সও থাকবেই, বরং এই অবকাশে রেড রোড কার্নিভাল বনাম প্যাটেল মূর্তি নির্মাণ নিয়ে একটা কস্ট-বেনিফিট আলোচনা করা যেতে পারে।

বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের প্রায় নব্বই শতাংশই (বিধানসভা কেন্দ্রের বিচারে) ফারাক্কার দক্ষিণে। এই অংশটিকে ইতিহাসের ষোড়শ জনপদের তালিকায় পাওয়া যায় না। চার ধাম বা দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গের কোনোটাই এখানে নেই। আকর্ষণীয় পর্যটন কেন্দ্রের বিচারেও এই অঞ্চলটি বড়োই দীন। সেই সঙ্গে জনসংখ্যার চাপে এই ভূখণ্ডটির প্রায় নাভিশ্বাস উঠছে। এহেন বাস্তবে একটুকরো দীঘার মধ্যে গোয়াকে কিংবা পর্যটক বহন ক্ষমতা হারানো দার্জিলিংকে সুইজারল্যান্ড বানাবার ফ্যানটাসিতে রাজ্য সরকার স্বপ্নবিলাসী। তেমনই একটি ভাবনা হলো রেড রোড কার্নিভালের সঙ্গে রিও কার্নিভালের তুলনা। এক লক্ষণীয় সমাপতনের মতো এই কার্ণিভালের সূচনা আর গুজরাটে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের মূর্তির উন্মোচন প্রায় একই সঙ্গে ঘটে। যে মূর্তি দর্শনের জন্য মাত্র এক বছরে টিকিট বিক্রি থেকে ৬৩ কোটি টাকা আয় হয় (তাজ দর্শনের টিকিট বিক্রি থেকে একই সময়ে ৫৬ কোটি টাকা আয় হয়েছিল), তার পরিকল্পনাকারকে চতুর বানিয়া বলা যেতেই পারে। রেড রোড কার্নিভালের তেমন কোনো রেকর্ড নেই।

২০১৮ সালে পুজোর মুখে নর্মদা জেলার সাধুবেট দ্বীপে সর্দার প্যাটেলের এই বিশাল মূর্তির আবরণ উন্মোচন করেন প্রধানমন্ত্রী। পাঁচ বছরে লার্সন টুবরো দ্বারা নির্মিত। এটি নির্মাণে খরচ হয় ২৯৮৯ কোটি টাকা। কেবল মূর্তিই নয়, নর্মদা প্রকল্পের অনুসারী এলাকা জুড়ে ১২ কিলোমিটার দীর্ঘ কৃত্রিম জলাশয় দিয়ে নির্মিত গরুড়েশ্বর নদীবাঁধ সমগ্র প্রকল্পটির অন্তর্গত। স্ট্যাচুটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত। তার তিনটি অংশে দর্শনার্থীরা যেতে পারবে। সেগুলো হলো, এক ভিত্তি ভূমি থেকে মূর্তির জানু ও গোড়ালির মধ্যবর্তী অংশ। তার মধ্যে আছে প্রদর্শনী, স্মারক উদ্যান ও মিউজিয়াম। দুই,

মূর্তির উরু পর্যন্ত অংশ। তিন, পর্যবেক্ষণ গ্যালারি। চতুর্থ অংশ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সংরক্ষিত। সর্বশেষ অংশে রয়েছে মূর্তির মাথা। এছাড়া রয়েছে জনজাতি সংস্কৃতি প্রদর্শনের অডিয়োভিসুয়াল ব্যবস্থা। রয়েছে দুটি লিফট, যেগুলো মাত্র ৩০ সেকেন্ডে ৫০২ ফুট উচ্চতায় উঠতে পারবে। দাবি করা হচ্ছে সমগ্র কর্মকাণ্ডের ফলে ১৫০০০ জনজাতি মানুষের স্থায়ী কর্ম সংস্থান হবে।

বিশ্বে মূর্তি নির্মাণ নতুন নয়। ব্রাজিলের রিও ডি জেনেইরোতে Christ the Redeemer (ভিত্তি-সহ ১২৫ ফিট), নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটনের Statue of Liberty (ভূমি থেকে ৩০৫ ফিট) বা চীনের হেনানে ফোদুশানে সুরম্য পরিসরে বানানো তথাগতের Spring Temple (পদ্ম-সহ ৪২০ ফিট) – সব কিছুকে ছাড়িয়ে ৫৯৭ ফিটের এই Statue of Unity বিশ্বে প্রথম স্থান অধিকার করে ফেলেছে। এই নির্মাণ প্রকল্পকে সমর্থন না করলেও এটা যে একটা স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি সেটা অস্বীকার করা যায় না। প্রধানমন্ত্রীর উদ্যোগে প্যাটেল মূর্তির মতো দুর্গোৎসব শেষে কলকাতার রেড রোডে সারিবদ্ধ প্রতিমা নিরঞ্জনের পরিকল্পনাটি আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর। কলকাতার দুর্গাপুজোর বিরাটত্ব ও বর্ণময়তা বর্তমানে সারা বিশ্বে পরিচিত। মহানগরীর ১০০টি মেগা পুজো কমিটি নিয়ে গড়ে ওঠা Forum for Durgotsob-এর সভাপতি বোসপুকুর শীতলা মন্দিরের কাজল সরকারের মতে পাঁচদিনের এই উৎসবে কেবল কলকাতা শহরেই প্রায় ৫০০০ কোটি টাকার লেনদেন হয়। সমগ্র রাজ্যে সংখ্যাটা ১৫০০০ কোটি টাকার মতো। এর ফলে ছয় মাসে প্রায় চার লক্ষ লোকের কর্ম সংস্থান হয়। ENKON-এর রবি পোদ্দার ও Brand and Beauty-র অভিষেক ভট্টাচার্যের মতে শহরের বড়ো বাজেটের মেগা সেলিব্রেশনের মধ্যে ৫০০ থেকে ৮০০ কোটি টাকার মতো কর্পোরেট স্পনসরশিপ যুক্ত। এই দুজন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিজ্ঞাপনদাতাদের মধ্যে সেতুর কাজ করেন। বর্তমানে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো এমন পৃষ্ঠপোষকতার অংশ নেয়। এমনকী ১০০টির মতো বড়ো আবাসনের পুজোয় রান্না করা ভোগ পরিবেশনের দায়িত্বেও এরা আগ্রহ দেখাচ্ছে।

এই দুর্গপুজোর সুযোগে গণ সংযোগের কাজটিও রাজনৈতিক দলগুলি করে থাকে। আইসিসি-র ডিরেক্টর রাজীব সিংহ আগামী ২০৩০ সালে কলকাতা দুর্গোপুজোর মধ্যে কুম্ভ মেলার মতো সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন। একই ভাবে Merchant's Chamber of Commerce-এর প্রেসিডেন্ট বিশাল ঝাঝারিয়া এই উৎসবের আন্তর্জাতিক বিপণনের পক্ষে সওয়াল করেছেন।

পাঁচ দিনের এই মেঘা ইভেন্টে শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্য প্রশাসনকে অকল্পনীয় পরিশ্রম করতে হয়। সেই সঙ্গে বহন করতে হয় বিপুল খরচের বোঝা। সেই তুলনায় ব্যবসায়িক পরিকল্পনার মাধ্যমে রাজস্ব বৃদ্ধির কোনো ভাবনাচিন্তার কথা তেমন নজরে আসে না। মহারাষ্ট্রের নাগপুর, পুনে, মুম্বাইতে গণেশ পুজোর কোনো কোনো মণ্ডপে প্রবেশ কর চালু করেছে। আমাদের রাজ্য প্রশাসন নিঃশুল্ক বইমেলায় বিনামূল্যে পানীয় জলের পাউচ বিতরণ করে। তেমনই দুর্গোৎসব থেকে আয় করাকে 'বেওসা' ভেবে থাকতে পারে। আর্থিক লেনদেন ও সামরিক কর্মসংস্থান ছাড়া কোনো স্থায়ী সম্পদ সৃষ্টি এক্ষেত্রে ঘটে না। বরং কয়েক কোটি টাকা একমুখী সরকারি ব্যয় হয়। সরকারি খরচে প্রতিমা নিরঞ্জনের এহেন দৃষ্টান্ত অন্য কোথাও নেই। কোনো কোনো মহল থেকে সরকারের এমন ধর্মানুষ্ঠানে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগও তোলা হচ্ছে। দুর্গোপুজোকে পিতৃপক্ষে বিস্তৃত করে মুখ্যমন্ত্রী সমালোচিতও হয়েছেন।

সামগ্রিক বিচারে সরকারের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত নৈর্ব্যক্তিক ভূমিকা নিয়ে এই উৎসব থেকে যতটা সম্ভব মূলধন সৃষ্টি করা। গুজরাটের থেকে এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গের অনেক শেখার আছে।

শোক সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার প্রবীণ স্বয়ংসেবক পরশুরাম গুপ্ত (লালাবাবু) গত ১৩ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। তিনি ২ পুত্র , ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি ১৯৬০ সালে তদানীন্তন বিহারের সাহেবগঞ্জে স্বয়ংসেবক হন। কর্মসূত্রে মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। ১৯৮০ সাল থেকে ধুলিয়ান এলাকায় সঙ্ঘকাজ বিস্তারে তিনি মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। তাঁর বড়ো পুত্র শৈলেশ গুপ্ত বেশ কয়েক বছর সঙ্ঘের প্রচারক ছিলেন। পরে জেলা কার্যবাহের দায়িত্ব নির্বাহ করেন।

* * *

কলকাতার স্বয়ংসেবক তথা স্বস্তিকার বিশিষ্ট লেখক ডাঃ রবীন্দ্রনাথ দাসের বড়দা (জেঠতুতো) বিপ্র কুমার দাস গত ৭ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭২ বছর। তিনি বাল ব্রহ্মচারী রূপে সারাজীবন ধুলিয়ানের গৌরমন্দিরের পুরোহিতের কাজে নিযুক্ত ছিলেন।

* * *

হাওড়া জেলার উলুবেড়িয়া খণ্ডের মাধবপুর স্বামী বিবেকানন্দ শাখার মুখ্যশিক্ষক প্রেমকুমার মণ্ডল ও স্বয়ংসেবক প্রদীপ মণ্ডলের বাবা রামপ্রসাদ মণ্ডল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ১৬ সেপ্টেম্বর পরলোকগমন করেন।

বিশেষ রচনা

ধর্মনির্ভর আর্থিক উৎকর্ষতা এবং ধর্মকেন্দ্রিক আর্থিক ভারসাম্য

দুরারোগ্য ব্যাধির থেকে আরোগ্য লাভের জন্য আয়ুর্বেদের বিকল্প নেই। অনেক রোগ আছে যেখানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান হার মেনে গেছে, আয়ুর্বেদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পৃথিবী জুড়ে আয়ুর্বেদ এখন চর্চার বিষয়, আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বিতশ্রদ্ধ মানুষ আয়ুর্বেদের শরণাপন্ন হচ্ছেন।

সুজন পাণ্ডা

আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক প্রাপ্তির জন্য মানসিক প্রশান্তি অনিবার্য বিষয়। মানসিক বিকারগ্রস্ত ব্যক্তি অধ্যাত্মমার্গে অনুপযুক্ত। অধিকাংশ মানুষ যেন আধ্যাত্মিক সুখ লাভ করতে পারেন সে কারণে বৈদিক দর্শনের কার্যপ্রণালীকে মানুষের জন্য লাভপ্রদ ও লৌকিক সুখের উপযোগী করে কার্যকরী করা হয়েছিল। কোনো মানুষ যদি আর্থিকভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, অন্নের সংস্থান না করতে পারে, মানসিক অবসাদের কারণে ধর্ম, কাম, মোক্ষ পুরুষার্থকে সফল করতে পারে না। মানুষ যেন এইরকম ভারসাম্যহীন অবস্থার মধ্যে না পড়ে, বৈদিক সমাজ সংরচনা সে কারণে একজন মানুষের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে আর্থিক সুরক্ষাকে নিশ্চিত করেছিল।

যে সব মানুষ সনাতন ধর্মের জ্ঞান-বিজ্ঞানকে বিন্দুমাত্রও বুঝতে- জানতে অসমর্থ বা অন্য কোনো অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে সনাতন ধর্মকে গালিগালাজ, বদনাম করার ঠিকা নিয়ে রেখেছেন, তারা একথাটা প্রায়ই বলেন, 'ধর্ম কি খাওয়াবে?' বা ধর্মস্থান, মন্দির, মঠের জায়গায় অন্য কিছু করার ব্যাপারে ওকালতি শুরু করেন। বর্তমানে অযোধ্যায় রামমন্দিরের পক্ষে আদালতের রায় বেরোনো এবং শ্রীরাম মন্দিরের ভূমিপূজন প্রসঙ্গে তাদের গাত্রদাহ স্বাভাবিক ব্যাপার। এই সমস্ত মানুষ হয় সেক্যুলারিজম নামক বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী মতাদর্শের প্রতিনিধি, না হয় মার্কসীয় কমিউনিজমের আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্কের কুশল কারিগর। 'বিপ্লব' তাদের মূলমন্ত্র বিপ্লব মানে সুপরিকল্পিতভাবে অস্থিরতা তৈরি করাই তাদের লক্ষ্য। তাঁরাও আরও বলেন 'ধর্ম কি ব্যবসা করার জায়গা?' তাদের উদ্দেশ্যে— ধর্মই খাওয়ায়, ধর্মই ব্যবসা করার জায়গা ধর্ম বাদ দিয়ে মন্দির-মঠগুলো বাদ দিলে অর্থব্যবস্থা টাল খেয়ে মুখ থুবড়ে পড়বে। ধর্ম হলো ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ নামক চার পুরুষার্থ চরিতার্থ করার একমাত্র বিকল্প। কথাগুলো কঠিন। বুঝতে সময় লাগবে।

আস্থাই স্বস্তি, স্বচ্ছন্দ ও পরিপূর্ণতা আনে। আস্থাবানরা সেটা ভালো করেই জানেন। প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত সনাতনধর্মীরা তীর্থ- পুণ্যের ধারাপ্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রেখে চলেছেন। যে স্থান থেকে পুণ্যাভিলাষী, ধর্মপিপাসু তীর্থযাত্রীরা আসছেন, সেই স্থান থেকে নির্দিষ্ট তীর্থক্ষেত্রে এবং তার পারিপার্শ্বিক বহুদূর পর্যন্ত স্থানের অর্থনীতি সেই তীর্থক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে।

অতি প্রাচীনকালে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম প্রান্ত চার ধামকে কেন্দ্র করে চাতুষ্কৌণিক মণ্ডলের মাধ্যমে একত্রীকরণ করা হয়েছিল। চারধামকে সংযোগকারী দ্বাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ এবং একান্ন সতীপীঠ আধ্যাত্মিকতার ঠোস বুনন শৈলীতে সংযুক্ত ছিল, যাতে আর্যাবর্তের সমস্ত মানুষের, মানব ধর্মের চার পুরুষার্থকে এবং আধ্যাত্মিক উৎকর্ষতাকে চরিতার্থ করার ক্ষেত্রে অবস্থান যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

প্রাচীনকালে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত ছিল না। পুণ্যার্থীরা দল বেঁধে তীর্থক্ষেত্রে যাত্রা করতেন। ত্রিশ দিন পায়ে হেঁটে যাত্রা করে ত্রিশ-চল্লিশ দিনের কল্পবাস করে, সেই আধ্যাত্মিক পরিমণ্ডলে নিজেদের কৃতার্থ করতেন। আর্থিকভাবে স্বচ্ছল মানুষেরা কোনো সাধুর আশ্রমে বা তীর্থ পুরোহিতদের দ্বারা নির্দিষ্ট করা জায়গায় আশ্রয় নিতেন।

আর্থিকভাবে দুর্বল মানুষেরা নদীর ধারে, ফাঁকা মাঠে, গাছের তলায় অস্থায়ী ঠিকানা তৈরি করে দীর্ঘকাল আধ্যাত্মিক সুখ লাভ করতেন। তীর্থক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে হাজার হাজার মানুষের সমাগম হতো। সেই সমস্ত মানুষের প্রয়োজন পূর্তির জন্য বিশাল বাজারের প্রয়োজন, তীর্থক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে সারা বছর ধরে ব্যবসা, স্থানীয় মানুষদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তুলেছিল।

তীর্থ দান সনাতন ধর্মে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নিজের আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে এক চতুর্থাংশ ধর্মের অর্থাৎ জনকল্যাণের জন্য দান বিধি ছিল যা আজও আছে। দেবস্থানে দান— সেই দেবালয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী দেবতার উদ্দেশ্যে করা হয়, যাতে পরম্পরাগতভাবে বিধি বিধান অনুসারে সনাতনী কর্মকাণ্ডিক নিয়মকে, পবিত্রতাকে অক্ষুণ্ণ রাখা যায়। সাকার ঈশ্বরের সাধনায় দেব বিগ্রহকে বিভিন্ন উপচার সহযোগে আরাধনা করাই বিধি। অস্ত্র, উত্তরীয়, ভূষণ, গন্ধদ্রব্য, পুষ্প, বিগ্রহের বস্ত্র, অলংকার, ফুল-মালা, দেব বিগ্রহকে নিবেদন করা ভোগ— সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রীর উৎপাদনকারী মানুষজনের উৎপাদিত পণ্যের অনেকটাই মন্দিরে ব্যবহৃত হতো। ভক্তদের দান করা অর্থ দেব উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সামগ্রী কেনার কাজে ব্যবহৃত হতো। স্থানীয় ও পার্শ্ববর্তী বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত জনগোষ্ঠীর কাজের এবং অর্থ উপার্জনের কেন্দ্র ছিল মন্দির নগরীগুলি। দেবস্থানে ব্যবহৃত বস্ত্র, মন্দিরের ধ্বজ, দানের বস্ত্র, অঙ্গবস্ত্র, শাড়ি, ধুতি এইসব অত্যাবশকীয় নিত্যনৈমিত্তিক ব্যবহৃত জিনিসগুলি, তাঁতের কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষরা সেগুলি সারাবছর উৎপাদন করতেন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে অর্থ উপার্জন করতেন।

দেবালয়ের রান্নার কাজ মাটির পাত্রে হতো, মাটির জিনিস একবার ব্যবহার হলে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা হতো না, প্রতিবার রান্নার নতুন পাত্র, মাটির কলসী, থালা, গেলাস উৎপাদনকারী মৃৎশিল্পীরা সারাবছর জোগান দিতেন। তাদের আর্থিক ভারসাম্যহীনতার কোনো কারণই ছিল না। মিশ্র ধাতুর কারিগররা মূল্যবান থালা, বাসন, মূর্তি, পূজাসামগ্রী, প্রদীপ, ঘণ্টা উৎপাদন করতেন। মূল্যবান উন্নতশ্রেণীর সেইসব শিল্প সামগ্রীর উৎপাদনকারীরা কোনো কালেই আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে ছিলেন না। মন্দিরের জন্য ফুলের মালা, বেল মালা, কাঠি মালা, তুলসী মালা তৈরির শিল্পীরা আজ থেকে ১০০ বছর আগেও আর্থিক ভাবে স্বচ্ছল ছিলেন। হিন্দু মাত্রই তুলসী মালা, রুদ্রাক্ষ মালা, বেল মালা, কাঠি মালা পরার নিয়ম ছিল। বর্তমান সমাজব্যবস্থা নাস্তিকতা, আধুনিকতা তাদের আর্থিকভাবে পঙ্গু করে তুলেছে। গন্ধ দ্রব্য উৎপাদনকারী শিল্পীরা, ধুনা, গোবর, কর্পূর, চন্দন সহযোগী ধূপ উৎপাদন করতেন যার প্রচুর চাহিদা ছিল। বর্তমানে বড়ো বড়ো কোম্পানিগুলি বাঁশ যা জ্বালানো হিন্দুধর্মে নিষিদ্ধ, চারকোল, ক্যামিক্যাল সহযোগে বিষাক্ত ধূপ তৈরি করে সেই সমস্ত মানুষগুলিকে কর্মহীন করেছে।

দেবস্থানে বাদ্য যন্ত্রের ব্যবহার, নাম সংকীর্তনে ঢাক, ঢোল, মৃদঙ্গ, খোল এইসব শিল্পকলা এখন লুপ্ত প্রায় তার পরিবর্তে প্লাস্টিকের বাদ্যযন্ত্র, ইলেকট্রনিক স্বয়ংক্রিয় বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক প্রয়োগ শিল্পের সঙ্গে সঙ্গে বায়নশিল্পীদের রাস্তায় নামিয়েছে। নাম-সংকীর্তনে পারদর্শী মানুষদের চাহিদা আজ নেই বললেই চলে। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগেও এই মানুষগুলির গায়ন শিল্পের চর্চা তাদের প্রতিভা, পারদর্শীতার কথা দূরদূরান্তে শোনা যেত। ভেড়ার লোম থেকে তৈরি আসন শিল্প আজ লুপ্ত প্রায়। এককালে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত মানুষদের আর্থিক অস্বচ্ছলতা ছিল না। আজ তাঁরা অন্য পেশায় যুক্ত। তীর্থ স্থলে কাঠের, পাথরের দেব মূর্তির চাহিদা চিরকালই ছিল আজও আছে। কিন্তু সেই মানুষগুলির হাতে আজ কাজ নেই। আধুনিক সিএনসি মেশিন তাদের কাজ কেড়ে নিয়েছে। ব্যবসা একই আছে কিন্তু যাদের কাজ তারা বেকার হয়ে দুর্দশার শিকার। মানুষের কাজ মেশিনে করে। একশো জনের পেটের ভাত একটি মেশিন কেড়ে নিয়েছে। এমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির কী প্রয়োজন? সনাতন ধর্মে গো-মাতাকে সর্বোচ্চ স্থান দেওয়া হয়েছে। গোমূত্র সনাতন সংস্কৃতির সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। গো-পালকরা চিরকালই সমৃদ্ধ। বর্তমানে অত্যাধুনিক ডেয়ারি, বিদেশি প্রজাতির গো-বংশের ব্যাপক উৎপাদন, দেশীয় প্রজাতির গোবংশ আজ অবলুপ্তির পথে। দুধ উৎপাদন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু সেই দুধকে অমৃত বলা যাবে না। দক্ষিণ ভারতের পেরিয়ার সম্প্রদায়, যারা বিদ্যা ও বাস্তুকলায় নিপুণ ছিলেন, দক্ষিণ ভারতের হাজার হাজার মন্দির যাদের হাতে তৈরি, শাস্ত্রসম্মত বাস্তুকলার নমুনা হাজার হাজার বছরের পুরানো দক্ষিণ ভারতের মন্দিরগুলিতে দেখা যায়। মন্দির তো অনেক তৈরি হচ্ছে, পরম্পরাগতভাবে দক্ষ শিল্পীদের পথে বসিয়ে আধুনিক সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কি পারবে পুরাতন কৌলিন্য এবং স্থায়িত্বকে টেক্কা দিতে? প্রায় সমস্ত দেবস্থানেই দেবতাকে অন্নভোগ নিবেদন করা হতো। বিখ্যাত ধর্মস্থানগুলিতে এত অন্ন-প্রসাদ তৈরি হতো, হাজার হাজার মানুষ খেয়ে শেষ করতে পারতেন না। পুরী জগন্নাথ মন্দির, তিরুপতি মন্দির, দক্ষিণ ভারতের অন্যান্য মন্দিরগুলিতে সেই পরম্পরা আজও চলে আসছে। অন্নভোগ রান্নার জন্য বাসনপত্র, চাল-ডাল, শাকসবজি, কাঠ, রাঁধুনি, পরিবেশক — প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অসংখ্য মানুষ এই কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতেন। বর্তমানে যন্ত্রযুগে জীবন গতিশীল হয়েছে। নিষ্ঠার জায়গায় আড়ম্বর স্থান পেয়েছে। অর্থব্যবস্থা প্রাচীনকাল থেকে অনেক বেশি ধর্মকেন্দ্রিক বা ধর্মনির্ভরশীল হয়েছে। উত্তর থেকে দক্ষিণ, পূর্ব থেকে পশ্চিম, হিমালয় থেকে কন্যাকুমারী, শ্রীক্ষেত্র থেকে সৌরাষ্ট্র, গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর, অযোধ্যা থেকে রামেশ্বরম, বিশ্বনাথ, সোমনাথ, বৈদ্যনাথ, কেদারনাথ, আটদিক একে অপরের সঙ্গে আধ্যাত্মিকতার অদৃশ্য বন্ধনে আবদ্ধ তেমনি ভারতীয় রেলের আয়ের বিশাল অংশ ধর্মনির্ভর। ট্যুর ট্রাভেল কোম্পানির আধুনিক ব্যবসা, প্রধান ধর্মস্থানকে কেন্দ্র করে আশেপাশের দর্শনীয় স্থল তীর্থযাত্রীকে ভ্রমণপিপাসুতে পরিণত করেছে। সেইসব ট্যুর কোম্পানিগুলিকে কেন্দ্র করে ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা প্রচুর মানুষকে রোজগার দিচ্ছে। তীর্থস্থানের তীর্থ

পুরোহিতের জায়গা এখন ট্রাভেল গাইডরা নিয়েছে। তীর্থ শহরকে কেন্দ্র করে ছোটো বড়ো হোটেল, লজ, গেস্ট হাউসের ব্যবসা, খাবারের দোকান, হ্যান্ডিক্রাফ্‌ট ব্যবসা, প্রাদেশিক পোশাকের ব্যবসা, ইলেকট্রনিক্স ব্যবসা, বাচ্চাদের জন্য বিদেশি খেলনার ব্যবসা, স্পট ট্রাভেলের জন্য ছোটো ছোটো গাড়ি, ই-রিকশা, অটোর ব্যবসা লক্ষ লক্ষ মানুষকে বাঁচিয়ে রেখেছে।

ভারতের প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলিতে প্রতিবছর কত তীর্থযাত্রীর আগমন ঘটে তার ছোট্ট হিসেব দেওয়া হলো ঃ পুরী জগন্নাথ মন্দির প্রতি বছর ৪০ লক্ষ, হিমালয়ের চারধাম প্রতি বছর ৩০ লক্ষ, সোমনাথ-দ্বারিকা ৫০ লক্ষ, রামেশ্বরম ৯০ লক্ষ, কাঞ্চিপুরম ৪৫ লক্ষ, কন্যাকুমারী ৭০ লক্ষ, মাদুরাই ৮০ লক্ষ, তিরুপতি মন্দির প্রতি বছর ৪ কোটি, কাশি বিশ্বনাথ প্রতি বছর ৬০ লক্ষ, মধুরা-বৃন্দাবন প্রতি বছর ১০ কোটি, বৈষ্ণোদেবী প্রতি বছর ৮০ লক্ষ। এখানে প্রধান প্রধান তীর্থস্থানগুলিই উল্লেখ করা হলো। সারা ভারতে ছোটো ছোটো অজস্র দেবস্থান আছে যেখানে সারা বছরে ২-৫ লক্ষ তীর্থযাত্রী বা পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। সংখ্যা দেখে সহজেই অনুমান করা যায় ভারতের অর্থব্যবস্থার ধর্ম নির্ভরশীলতা।

হিমালয়ের দুর্গম ক্ষেত্রে কেদার, বদ্রী, গঙ্গোত্রী, যমুনেত্রী, বৈষ্ণোদেবী, অমরনাথ এই প্রধান তীর্থক্ষেত্রগুলি ছাড়াও অজস্র ছোটো ছোটো মন্দির শহর ভারতের হিমালয় ক্ষেত্রের পাঁচ কোটি লোকের জীবন প্রবাহের গতিকে অক্ষুণ্ণ রেখেছে। এইসব দুর্গম স্থানে বিকল্প রোজগারের কোনো উপায় নেই। লক্ষ লক্ষ তীর্থযাত্রী প্রতি বছর হিমালয় ভ্রমণ করেন। ছোটো ছোটো দোকান, খাবার হোটেল, ছোটো ছোটো গেস্ট হাউস, লজ, ছোটো গাড়ির ট্রান্সপোর্ট ব্যবসা এই এলাকার লোকের আয়ের উৎস। এছাড়াও অনেকে গো-পালন এবং আয়ুর্বেদিক বনৌষধি সংগ্রহ করে জীবন নির্বাহ করেন। যোগ, আয়ুর্বেদ, জ্যোতিষ বেদের এক একটি অংশ। বর্তমান দিনে যোগ, আয়ুর্বেদের বাণিজ্যিকীকরণ হয়েছে। যোগ সাধক জীবনের অপরিহার্য অংশ। অষ্টাঙ্গযোগের মাধ্যমে শরীর এবং মনের কায়াকল্প হয়। গুরুকুলেই বিদ্যার্থীরা যোগ শিক্ষা লাভ করতেন। হঠ যোগের সাধকরা অত্যন্ত গোপনীয়তার সঙ্গে গুরুর কাছ থেকে এই বিদ্যা গ্রহণ করতেন। পরম্পরাগতভাবে উপযুক্ত সাধকরাই এই শিক্ষা লাভ করতে পারতেন। বর্তমানে যোগের বাণিজ্যিকরণ হয়েছে। যোগ ও ভোগ মিশে গিয়ে পরস্পর বিরোধী একটা অদ্ভুত ধরনের জিনিস তৈরি হয়েছে। হাজার হাজার বিদেশি যোগ শিখতে আসছে, অপপ্রয়োগ হলেও যোগ এখন ইন্টারন্যাশনাল ব্যবসাস। বাণিজ্যিক দৃষ্টি দিয়ে যোগ অনেক মানুষের মোটা টাকা রোজগারের জায়গা।

আয়ুর্বেদ অথর্ব বেদের বিষয়। দুরারোগ্য ব্যাধির থেকে আরোগ্য লাভের জন্য আয়ুর্বেদের বিকল্প নেই। অনেক রোগ আছে যেখানে আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞান হার মেনে গেছে, আয়ুর্বেদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। পৃথিবী জুড়ে আয়ুর্বেদ এখন চর্চার বিষয়, আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় বিতশ্রদ্ধ মানুষ আয়ুর্বেদের শরণাপন্ন হচ্ছেন। বিদেশ থেকে হাজার হাজার মানুষ গবেষণা করতে, পড়তে ভারতে আসেন। আয়ুর্বেদ নিয়ে বিস্তারিত বলার প্রয়োজন নেই। মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিগুলি আয়ুর্বেদিক ফর্মুলার ওষুধ বানিয়ে কোটি কোটি টাকা রোজগার করছে।

পরম্পরাগতভাবে জ্যোতিষ শিক্ষার অভাবে অতি প্রাচীন এই সনাতনী বিদ্যাটি অপবাদের শিকার। আর্থিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে দেখলে গ্রহ, রত্ন, হিরে, চুনী, পান্না, নীলা, মুক্তার ব্যবসা অন্যসব ব্যবসাকে টক্কর দিতে পারে। গোটা পৃথিবীর ৭০ শতাংশ মানুষ বিষাদগ্রস্ত। অবসাদ কাটানোর কোনো ওষুধ নেই। বিকল্প রইল গ্রহ রত্ন যা হয়তো সাময়িক বা পূর্ণাঙ্গ স্বস্তি দিচ্ছে নাহলে মানুষ ব্যবহার করছেন কেন?

সনাতনী শিক্ষাব্যবস্থায়, সনাতন ধর্মে গুরুকুলে এবং পরম্পরাগত- ভাবে চৌষট্টি কলার শিক্ষা দেওয়া হতো। সেখানে বাস্তুবিদ্যা, পট্টিকা বেত্র বন কল্প, পানক রস, ধতুবদ, আকর জ্ঞান, চিত্র যোগ, মাল্যগ্রাংস বিকল্প, বৃক্ষায়ুর্বেদ যোগ, হস্ত লাঘব, গন্ধযুক্তী, যন্ত্রমাতৃকা, অত্তর বিকল্প, মণিভূমিকা, মাল্যগ্রথন, মণিরাগজ্ঞান, বিশেষকচ্ছেদ জ্ঞান, কেশ শেখর পীড় জ্ঞান, গীতজ্ঞান, নেপথ্য যোগ, তুর্ক কর্ম, লক্ষণ কর্ম, সূত্র সূচি কর্ম প্রভৃতি মুখ্য প্রযুক্তি বিদ্যা, কারিগরী বিদ্যা, প্রয়োগ একমাত্র এবং সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানে ছিল। লৌকিক বা পারলৌকিক বিজ্ঞানের শিক্ষা বৈদিক গুরুকুল থেকেই প্রাপ্ত হতো যা মানুষকে আত্মনির্ভর হতে সাহায্য করত।

ভারতীয় জ্ঞান পরম্পরা শুধুমাত্র আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ব্যবহারিক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেও চরম উৎকর্ষতা প্রাপ্ত ছিল যা বর্তমান অর্থশাস্ত্রে অবহেলা করা হয়। চার পুরুষার্থে 'অর্থ'কে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান দেবার কারণ— আর্থিক জীবন যে কোনো সমাজের বহুমুখী অভিবৃদ্ধির আধার। ভারতীয় সমাজের সাংস্কৃতিক ও পরম্পরাগত উৎকৃষ্টতার জড় বা শেকড় অত্যন্ত গভীর ও মজবুত। জন্মগত নিরন্তরতা থাকার কারণে সহজেই উপড়ে ফেলা কঠিন। পাশ্চাত্য সিদ্ধান্তের আবরণে চাপা পড়ে গেছে আমাদের প্রাচীন সনাতনী ব্যবহারিক জ্ঞান-বিজ্ঞান।

সনাতন ধর্ম প্রতিটি ব্যক্তির আর্থিক সমৃদ্ধির প্রতি যত্নশীল ছিল। নিজ নিজ ক্ষেত্রে পারদর্শী ব্যক্তি আর্থিক ভাবে সমাজকে সমৃদ্ধ করেছিল। বর্তমানে চৌষট্টি কলা, ষোলো বিদ্যার পরম্পরা অবলুপ্ত হয়ে গেছে। আধুনিক ব্যবহারিক বিজ্ঞান প্রাচীন চৌষট্টি কলা, কারিগরি বিদ্যাকে নকল করে আধুনিক বিশাল যন্ত্র আবিষ্কার করেছে। তার সঙ্গে ব্যক্তিবিশেষের স্বাধীনতা, সৃজনশীলতাকে শেষ করে দিয়েছে। বিশাল যন্ত্র তৈরি করে সুবিধা কিছুই হয়নি, প্রাচীন উৎকর্ষতাকে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। অর্থব্যবস্থা মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে কুক্ষিগত হয়ে আছে। যে কাজ স্বাধীনভাবে নিজে করতাম এখন বড়ো বড়ো কোম্পানির বেতনভুক্ত কর্মচারী হিসেবে করছি। এমন অর্থনীতি, বাণিজ্যনীতি কী প্রয়োজন, যা অন্যের পরম্পরা, কৌলিন্য, আর্থিক সম্পন্নতা, সৃজনশীলতাকে নষ্ট করে? ▮

শিক্ষা প্রসঙ্গ

ভারতীয় শিক্ষার স্বরূপ

ধর্মপুরুষার্থ ও শিক্ষা

ইন্দুমতী কাটদরে

গৃহস্থাশ্রম :

সমাবর্তন সংস্কার ও সমাবর্তন উপদেশের পর গৃহস্থাশ্রমে কীভাবে থাকা দরকার তার দিশা নির্দেশ লাভ করে ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রমের জন্য উপযুক্ত হয়ে থাকে। গৃহস্থাশ্রম নিজের সর্ব প্রকারের সাংসারিক দায়িত্ব পূরণ করবার আশ্রম। স্নাতক তখন গৃহস্থ হয়ে পড়ে। গৃহস্থের পরিভাষা হচ্ছে 'গৃহেষু দারেষু তিষ্ঠতি অভিরমতে ইতি গৃহস্থঃ' , অর্থাৎ যে ঘরে থাকে এবং পত্নী-সহ সুখে সংকার করেন তিনি গৃহস্থ। এবার তার গুরুগৃহে নয় বরং নিজের বাড়িতে বাস হয়ে থাকে।

গৃহস্থাশ্রমের দায়িত্ব :

বিবাহ : গৃহস্থাশ্রমের প্রথম সংস্কার হচ্ছে বিয়ে। গৃহস্থাশ্রম কখনই একা হয় না। ওটা পত্নীর সঙ্গেই হয়ে থাকে। গৃহস্থাশ্রম ধর্মাচারণের জন্য হয় এবং পতি-পত্নী দুজনে মিলেই সহ-ধর্মাচরণ করতে হয়। গৃহস্থাশ্রমের সমস্ত দায়িত্ব পালনের জন্য তার পত্নীর সঙ্গ অনিবার্য হয়, কারণ বংশপরম্পরা বজায় রাখবার জন্য তাকে সন্তানের জন্ম দিতে হয় এবং সেই কাজ পতি-পত্নী দুজনে মিলেই করতে পারে। এজন্যই সে যোগ্য কন্যাকে বিয়ে করে। কুল, গোত্র, বর্ণ জাতি ইত্যাদি বিশেষত্ব দেখে বর ও কন্যার একে অপরের বিয়ে সম্পন্ন হয়। এই দুই পতি-পত্নী সুযোগ্য সন্তানের জন্ম দেয়। সন্তান জন্ম দেবার পরও তারা সকল কর্তব্যকর্মে একে অপরের সঙ্গ দিয়ে থাকে।

ঋণত্রয় থেকে মুক্তি : ব্যক্তি জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই তিন প্রকারের ঋণ নিয়ে আসে। প্রথম হলো পিতৃঋণ, দ্বিতীয় হচ্ছে দেবঋণ ও তৃতীয়টা হচ্ছে ঋষি ঋণ। ঋষি জ্ঞানের ক্ষেত্রের ,দেব প্রকৃতির ক্ষেত্রের এবং পিতৃ অনুবংশের ক্ষেত্রের এমন এক তত্ত্ব যার কারণে মানুষের বর্তমান জন্মের জীবন সম্ভব হয়। জ্ঞান মানুষের জীবন সুসংস্কৃত করে তোলে, প্রকৃতি তার জীবনকে সুসংস্কৃত, সমৃদ্ধ, সুস্থ ও সুখী বানায় এবং পিত ার কারণেই তার জন্ম হয়ে থাকে ও তার সর্বপ্রকারের পরম্পরা প্রাপ্ত হয়। এ কারণেই এই তিনটির প্রতি তার কৃতজ্ঞ থাকতে হয় এবং সেই ঋণ থেকে মুক্ত হতে হয়। সে অধ্যয়ন করে ঋষিঋণ থেকে, যজ্ঞ করে দেবঋণ থেকে এবং সন্তানাদির জন্ম দিয়ে পিতৃঋণ থেকে মুক্তি পেয়ে থাকে।

পঞ্চযজ্ঞ : গৃহস্থকে পাঁচ প্রকারের যজ্ঞ করতে হয়। প্রথম ঋষিযজ্ঞ, দ্বিতীয় দেবযজ্ঞ , তৃতীয় ভূতযজ্ঞ, চতুর্থ মনুষ্যযজ্ঞ এবং পঞ্চম পিতৃযজ্ঞ। যজ্ঞের অর্থ হচ্ছে অপরের জন্য নিজের পদার্থের আহুতি দেওয়া অর্থাৎ ত্যাগ করা। প্রকৃতির, সমাজের ও নিজ ব্যক্তিগত জীবনের সাম্য বজায় রাখবার জন্য এবং সবার সঙ্গে মিলে জীবন সুখী, সমৃদ্ধ সুসংস্কৃত এবং সুস্থ হোক— এই দৃষ্টিতে এই যজ্ঞগুলোর রচনা করা হয়েছে।

মহাভারতে উত্তম গৃহস্থাশ্রমের বর্ণনা এরকম :

অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতানুকম্পনম্।
শমো দানং যথাশক্তি গার্হস্থ্যো ধর্ম উত্তমঃ।।
পরাদারেষ্বসংসর্গো ন্যাসস্ত্রীপরিরক্ষণম্।
অদত্তাদানবিরমো মধুমাসস্য বর্জনম্।।
এষ পঞ্চবিধো ধর্মো বহুশাখঃ সুখোদয়ঃ।।

অর্থাৎ অহিংসা, সত্যবচন, প্রাণীমাত্রেই দয়া কাম ও যথাশক্তি দান হচ্ছে উত্তম গৃহস্থধর্ম। পরস্ত্রীর সঙ্গে সংসর্গ না রাখা, অপরের স্ত্রীকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া, একবার দেওয়া ফিরিয়ে না নেওয়া, মদ ও মাংস না খাওয়া এগুলি হচ্ছে পঞ্চপ্রকারের ধর্ম। এদের অনেক শাখা আছে। এসব হচ্ছে বহু সুখদায়ক।

অতিথি সেবা : গৃহস্থধর্মে অতিথিসেবার অনেক মাহাত্ম্য রয়েছে। অতিথির অর্থ হচ্ছে যে পূর্বসূচনা ছাড়া এসে থাকে, যার সঙ্গে কোনো প্রকারের দেওয়া নেওয়া নেই এমন কোনো ব্যক্তি। এমন অজ্ঞাত ব্যক্তিরও খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করে তার সন্তুষ্ট করা হচ্ছে গৃহস্থের কর্তব্য।

যজ্ঞ দান ও তপস্যা : এই তিনটি হচ্ছে গৃহস্থধর্মের বিশেষ আচরণ। গৃহস্থ অধিক থেকে অধিকতর দেবার জন্য রয়েছে। সে সর্বপ্রকারের যজ্ঞ করে থাকে।

অর্থ ও কাম : গৃহস্থাশ্রমে অর্থার্জন করতে হয়। সর্ব প্রকারের সাংসারিক সুখভোগ করতে হয়। কিন্তু তা ধর্মের পথেই হওয়া দরকার। গৃহস্থধর্মানুগ অর্থ ও কামই হচ্ছে গৃহস্থের ধর্মাচরণ। এই প্রকারের অর্থ ও কাম তাকে মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়। সুখ, সমৃদ্ধি, সংস্কার ও জ্ঞান গৃহস্থাশ্রমের সেব্য বস্তু। যজ্ঞ, দান, তপস্য ও লোককল্যাণ হলো গৃহস্থধর্মের আচার। গৃহস্থাশ্রম হচ্ছে সর্বপ্রকারের দায়িত্ব সম্পাদনের সময়। সর্বপ্রকার শক্তিসম্পন্ন হয়ে এখন ব্যক্তি বাস্তবিক পক্ষে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে। সে বিয়ে করে, ঘর বাঁধে ও গৃহস্থ হয়ে ওঠে। এটা জীবনের সর্ব প্রকারের আনন্দ উপভোগ করবার সময়, এখন সে অর্থার্জন করে। বৈভব পেয়ে থাকে। তার আনন্দ ও উপভোগ ধর্মানুসারে হওয়া দরকার। তার বিয়ের পরিণাম হচ্ছে সন্তানের জন্ম। কুল, জাতি, বর্ণ, সমাজ প্রভৃতির প্রতি তার যে কর্তব্য সেসব পূরণ করবার সময় হচ্ছে এই কাল। নিজ পরিজনের ভরণ পোষণ এবং রক্ষাও তাকে করতে হয়। নিজের সামাজিক দায়িত্ব তাকে সম্পন্ন করতে হয়। পূর্বপুরুষদের ঋণ থেকে তাকে মুক্ত হতে হয়। সমর্থ

সন্তানের রূপে সমাজকে ভালো নাগরিক দিতে হয়। নিজ ব্যবসাতেও নতুন অনুসন্ধান করতে হয়। ব্রহ্মচর্যাশ্রম, বাণপ্রস্থাশ্রম ও সন্ন্যাসাশ্রমকে আশ্রয় দিতে হয়। সার্বজনিক ব্যবস্থাগুলোতে তাকে যোগদান করতে হয়। সারা সমাজ গৃহস্থাশ্রমের আশ্রয়েই বেঁচে থাকে। এজন্য গৃবস্থাশ্রমকে সব আশ্রমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলা হয়।

বাণপ্রস্থাশ্রম :

ধর্মাচরণ করতে করতে, সুখ ভোগ করতে করতে পঁচিশ বছর পেরিয়ে যায়। তার সন্তানেরা এতদিনে যোগ্য হয়ে ওঠে। তাদেরও বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ঘরে পৌত্রাদির জন্ম হয়ে গিয়েছে। শরীর ক্লান্ত হতে শুরু করেছে। কেশ পাকতে শুরু করেছে। ত্বকে সংকোচন শুরু হয়ে গিয়েছে। ইন্দ্রিয়সমূহও ক্লান্ত হতে শুরু করেছে। সঙ্গে সঙ্গে নিজের সব কর্তব্যের পূরণ করে ব্যক্তি কৃতকার্য হয়ে ওঠে। এখন সে নিজের সাংসারিক দায়িত্বগুলো নিজের পুত্রের উপর সমর্পণ করে আসক্তিহীনতার কারণে গৃহত্যাগ করতে চায়। বাণপ্রস্থের অর্থ হচ্ছে যে বনের প্রতি প্রয়াণ করেছে এমন ব্যক্তি।

বাণপ্রস্থের মুখ্য লক্ষ্যগুলো হচ্ছে এরকম :

গৃহত্যাগ : ব্রহ্মচর্যাশ্রমেও ব্যক্তি নিজগৃহে থাকে না। কিন্তু সে গুরুগৃহে বাস করে। সে গুরুর ছত্রছায়া তথা তার অধীনে থাকে। বাণপ্রস্থাশ্রমে যে গৃহত্যাগী কিন্তু স্বাধীন থাকে। সে গৃহত্যাগ করে এবং তার সঙ্গেই গৃহের সুখসুবিধাও ত্যাগ করে থাকে। সে স্ত্রীকে পুত্রের উপর সমর্পণ করে। যদি স্ত্রী সঙ্গে থাকতে চায় তবে সে পত্নীর সঙ্গে গৃহত্যাগ করে এবং বনে থাকতে শুরু করে। বনে যে সুবিধা পাওয়া যায় তার দ্বারাই জীবন ধারণ করে।

অধিকার ত্যাগ : সাংসারিক দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে সে সাংসারিক অধিকারও ত্যাগ করে।

ধর্মাচরণ : এই আশ্রমেও অতিথিসেবা, যজ্ঞ, দান ও তপস্যা ছাড়া যায় না।

সরলতা : সে বনজ কন্দ, মূল, ফলাদি খেতে থাকে। দিনে একবার আহার করে। সাদা বস্ত্র ধারণ করে। সাজসজ্জা সে করে না। অগ্নিহোত্র করে। প্রাণীদের প্রতি দয়াভাব রাখে।

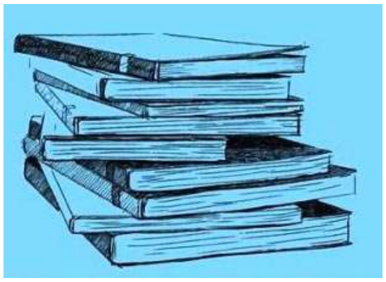

স্বাধ্যায় : বাণপ্রস্থ হচ্ছে স্বাধ্যায়কল্প। শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও শিক্ষাদান তাকে করতে হয়। চিন্তাশক্তি দ্বারা তার মর্ম বোঝাবার চেষ্টা করতে হয়। তিতিক্ষা,তপস্যা, বৈরাগ্য , মুমুক্ষা হচ্ছে বাণপ্রস্থের কেন্দ্রীয় ভিত্তি।

বাণপ্রস্থাশ্রম হচ্ছে নিবৃত্তি কাল। ক্লান্ত ইন্দ্রিয় ও মনকে বিশ্রাম দেবার সময়। সঙ্গে সঙ্গে আসক্তিহীনতা ও ভগবদ্‌ভক্তিরও সময়। পরিবারকে তথা সমাজকে নিজ জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে দিক নির্দেশ করতে হয় এই সময়ে। একই সঙ্গে সকল প্রকার অধিকার ত্যাগের এটাই হচ্ছে সময়। ভোগবিলাস ছাড়ার সময়। সাংসারিক জীবন থেকে মুক্ত হয়ে নিজ কল্যাণ হেতু তপস্যা করবার প্রকৃষ্ট সময় হচ্ছে এটা।

সন্ন্যাসাশ্রম : বাণপ্রস্থাশ্রমে তপস্যা, তিতিক্ষা, বৈরাগ্য , মুমুক্ষায় পটু হবার পর ব্যক্তি সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করে। এই আশ্রম বিনা অধিকারে গ্রহণ করা যায় না। ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ ও বাণপ্রস্থ মোটামুটি সবার জন্যই বিহিত কিন্তু সন্ন্যাস সবার জন্য নয় বরং যার তীব্র বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়েছে কেবলমাত্র তার জন্যই নির্দিষ্ট। বৈরাগ্য বিনা সন্ন্যাস ব্যর্থ ও মিথ্যে।

সন্ন্যাসাশ্রমের মুখ্য বিষয়গুলো এরকম :

সর্বসঙ্গপরিত্যাজ্য : সন্ন্যাসী সবকিছুকেই ছাড়ে। নিজের নাম, কুল গোত্র আত্মীয়পরিজন সবাইকে ত্যাগ করে থাকে। যজ্ঞ দান অতিথিসেবা যেমনটা বাণপ্রস্থীদের কর্তব্যও ছেড়ে দেয়। সে সবার, কিন্তু কেউই তার নিজের নয়। সে গেরুয়া বস্ত্র ধারণ করে থাকে। ভিক্ষাপাত্র, কৌপীন ও দণ্ডই হয় তার সম্পত্তি। তার প্রয়োজন খুব সামান্যই হয়। করতল ভিক্ষা এ তরুতল বাস হয় তার আদর্শ। সে অনিকেত ও নিরুদ্বিগ্ন। এদুটি হচ্ছে সন্ন্যাসের বিশেষ লক্ষণ। তিনি স্বপাক গ্রহণ করেন। সতত ভ্রমণ করা তার কর্তব্য হয়। সে একস্থানে বাস করে না। ভিক্ষা তার জন্য হচ্ছে অনিবার্য ও স্বাভাবিক। স্বাদকে জয় করা হচ্ছে তার সাধনা। সেজন্যই সে সমস্ত খাদ্যদ্রব্য একসঙ্গে মিশিয়ে জল দিয়ে সেই মিশ্রণ খেয়ে থাকে। সে শিক্ষা, পৈতা, জটা ইত্যাদি সবকিছু ত্যাগ করে। সে বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায় ইত্যাদি সবকিছুকেই ত্যাগ করে থাকে।

সন্ন্যাস নেওয়া যেমন অনিবার্য নয়, তেমনি সন্ন্যাস নেওয়ার সময়ও কিছু নির্দিষ্ট নয়। 'যদহরের বিবজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ', অর্থাৎ যেদিন বৈরাগ্য জাগে সেদিনই সন্ন্যাস নেওয়া উচিত।

তপস্যা : সন্ন্যাসীর একমাত্র কাজ হচ্ছে তপস্যা। প্রারম্ভে একান্তে থেকে উগ্র তপস্যা করারই বিধান রয়েছে। এরই সঙ্গে শাস্ত্রাধ্যয়নেরও বিধান রয়েছে। পরে ভ্রমণ করে লোককল্যাণার্থে উপদেশ দান করা হচ্ছে তার কাজ। কিন্তু তার মাঝেও তিতিক্ষা ও মুমুক্ষা ছাড়া যায় না। সন্ন্যাসী তপস্যা করেই লোককল্যাণ করে থাকে। সন্ন্যাসের বিশেষ সংস্কার হয়ে থাকে। সেরকমই সন্ন্যাসীর অন্ত্যসংস্কার ও অগ্নিসংস্কার হয় না। তাকে হয় সমাধি অথবা জলসমাধি দেওয়া হয়।

সন্ন্যাসীর দর্শনমাত্রই পবিত্র মনে করা হয়। শ্লোকে আছে—

যতীনাং দর্শনং চৈব স্পর্শনং ভাষণং তথা।
কুর্বাণঃ পূয়তে নিত্যং তস্মাৎ পশ্যেৎ নিত্যশাঃ।।

অর্থাৎ যতীর দর্শন স্পর্শ অথবা ভাষণ শ্রবণকারীকে পবিত্র করে থাকে। তাই নিত্য সন্ন্যাস বা সাধুসঙ্গ করা উচিত। তার কোনো প্রকার কোনো আত্মীয় সম্বন্ধ হয় না। সে নিজের নামকেও পরিত্যাগ করে থাকে। সে গৈরিক বস্ত্র ধারণ করে। সর্বসঙ্গ পরিত্যাগ এবং সর্বভূতের হিতই তার লক্ষ্য হয়। নিজ তপস্যা দ্বারা সে বিশ্বকল্যাণ করে থাকে। সে পূর্ণরূপে মোক্ষ অভিমুখী হয়।

এরকম আশ্রম ব্যবস্থা হচ্ছে ভারতীয় সমাজ রচনার এক অদ্ভুত ও বিশিষ্ট ব্যবস্থা। আজ তা হ্রাস পেয়েছে ঠিক, কিন্তু তা অজ্ঞানতার কারণেই হয়েছে। এই বিষয়ে পড়বার পর সবারই এর আবশ্যকতা ও উপযোগিতার ধারণা হয়। এখন আমাদের দায়িত্ব হচ্ছে যে আমরা যেন এটা পুনঃস্থাপিত করি। *(ক্রমশ)*

বিশেষ নিবন্ধ

কমিউনিস্ট চীনের স্বরূপ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে

চীন গরিব দেশগুলোকে ঋণের জালে জর্জরিত করে এমনকী ঋণগ্রস্ত দেশের ভূমি পর্যন্ত নিয়ে নিচ্ছে। শ্রীলঙ্কার হাম্বান টোটা বন্দর ৯৯ বছর লিজে দখল নেওয়া তারই উদাহরণ। এভাবে আফ্রিকান দেশ জিবুতিতে গড়ে তুলেছে সামরিক ঘাঁটি। সম্প্রতি শ্রীলঙ্কার নতুন সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রকাশ্যেই বলেছেন হাম্বান টোটা বন্দর চীনের কাছে ইজারা দেওয়া ছিল একটি ভুল সিদ্ধান্ত'।

চতুর্থ পর্ব

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥

একদিকে পাকিস্তান অন্যদিকে বাংলাদেশ। পাকিস্তান পুরোপুরি কবজায় সেই পঞ্চাশের দশক থেকে। এখন বাংলাদেশকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাইছে চীন। মিয়ানমারে বিনিয়োগ ও অবকাঠামো উন্নয়নে সহায়তা এমন পর্যায়ে যে, চীনের নাগালের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই সেখানকার শাসকদের। নেপালের কমিউনিস্ট সরকার নেপালকে চীনের একটি প্রদেশে পরিণত করার চেষ্টা করছে মনেপ্রাণে। তবে নেপালের মানুষ এর মধ্যেই প্রতিবাদী হয়ে উঠতে শুরু করেছেন, অর্থনৈতিকভাবে প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হয়ে বিক্ষোভ করছেন। ভুটান প্রথমদিকে ব্যতিক্রমী ভূমিকা নিলেও এখন চীন তাদের এলাকা দাবি করায় সংবিৎ ফিরেছে মনে হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে ভারত ভূখণ্ড দখলে থাবা বিস্তার করতে চাইছে চীন। কিন্তু সে স্বপ্ন কি আদৌ সফল হবে? চীন কি মনে করে পরিস্থিতি তাদের আগ্রাসনের অনুকূলে?

সমালোচনার মুখে বাংলাদেশ বলছে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক অর্থনৈতিক এবং ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক হৃদয়ের। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে যে সম্পর্কের সূচনা হয়েছে সে সম্পর্কে ব্যত্যয় ঘটাতে পারে এমন কোনো শক্তি নেই। এখন বলা হচ্ছে, ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক অতীতের যে কোনো সময়ের তুলনায় সর্বোচ্চ পর্যায়ে। কিন্তু চীনের সঙ্গে বর্তমান 'ওঠাবসা, যোগাযোগ' ভিন্ন কথা বলছে। ভিন্ন বার্তা দিচ্ছে।

গণমাধ্যমে প্রশ্ন করা হচ্ছে, বাংলাদেশ কি চীনা ঋণের ফাঁদে পড়তে যাচ্ছে? বাংলাদেশ ও চীন অবকাঠামো খাতে কোটি কোটি ডলারের চুক্তি সই করেছে। অর্থনীতিবিদদের একাংশ আশঙ্কা করছেন, ঢাকা বেজিংয়ের কাছে বাঁধা পড়ে যাচ্ছে এমনই আলামত লক্ষ্য করছেন তারা। গত তিন দশকে চীন বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি প্রকল্পে ঢালাও অর্থ ঢেলেছে। চীনের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরতা বাড়ছে দিন দিন। এক পরিসংখ্যানে বলা হয়েছে ২০১৮ সালে চীনের সরাসরি হিসেবটা এখানো পাওয়া যায়নি। এই পরিসংখ্যান ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আংকটাড) থেকে পাওয়া। বিদ্যুৎ খাতে চীনের ওপর নির্ভরতা ক্রমেই বাড়ছে বাংলাদেশের। ২৪ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে বাংলাদেশ চীনকে পাশে চায়।

বিদেশি ঋণ/বিনিয়োগ আসে দুই খাতে। সরকারি ও বেসরকারি। বেসরকারি খাতে আসে মূলত সাপ্লায়ার্স ক্রেডিটের মাধ্যমে। এই দুই খাতেই চীনের অংশ বড়ো রকমের। অন্তত দুজন অর্থনীতিবিদ নাম প্রকাশ না করার শর্তে এই প্রতিবেদককে বলেছেন, ঋণের সুদের হার, বিভিন্ন শর্ত খতিয়ে দেখা দরকার। যথার্থ হিসেবও আমাদের কাছে নেই। যে কোনো সময় আমরা সমস্যায় পড়ে যেতে পারি। বিশ্লেষকরা আরও বলছেন, চীনের অর্থায়নে প্রকল্প নির্বাচনেও আমাদের সতর্ক ও সাবধান হওয়া দরকার। অর্থনৈতিক ভাবে লাভজনক বা আমাদের জনগণের স্বার্থের অনুকূল নয় এমন ঋণ বা বিনিয়োগে যাওয়া উচিত নয়। এশিয়া আফ্রিকা-সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে চীন যেসব ঋণ দিয়েছে এদের অনেকেই সেইসব ঋণ পুনর্বিবেচনা করার কথা বলছে। শ্রীলঙ্কা তো সম্প্রতি বলেই দিয়েছে, হামবানটোটা বন্দর হারিয়ে তারা এখন বুঝতে পারছে কতবড়ো ভুল হয়ে গেছে। উদীয়মান অর্থনীতির দেশ মালয়েশিয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছে চীনের কয়েকশো বিলিয়ন ডলার

অর্থায়নে রেল প্রকল্প ও আবাসন প্রকল্প বাতিল করে। মালয়েশিয়ার নেতা মহাথির মোহাম্মদ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, তারা আর চীনের খপ্পরে পড়তে চান না। মালদ্বীপও থমকে দাঁড়িয়েছে, চীনের চেহারা স্পষ্ট হওয়ার পর সম্প্রতি দেশের বাজেট প্রণয়নের জন্য ভারতের কাছ থেকে ২৫০ মিলিয়ন ডলার সাহায্য চেয়েছে। আফ্রিকায় জাঁকিয়ে বসেছিল চীন, কিন্তু এখন পরিবর্তনের হাওয়া লেগেছে। সচেতনতা বাড়ছে সেখানে।

চীন উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশকে অবকাঠামোগত প্রকল্পের জন্য ঋণ গ্রহণে প্রলুব্ধ করে। এরপর সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তাদের নানাভাবে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়াস চালায়। 'সিএফজিডি' নামে একটি গবেষণা সংস্থার বিশ্লেষণ হচ্ছে, আটটি দেশ শিগগিরই চীনের এ ধরনের ষড়যন্ত্রের শিকার হতে যাচ্ছে। দেশগুলো হলো— জিবুতি, কিরগিজস্তান, লাওস, মালদ্বীপ, মঙ্গোলিয়া, মন্টিনিস্ত্রা, পাকিস্তান ও তাজিকিস্তান। একই ধরনের ফাঁদে পড়েছে আফ্রিকার দেশ জিবুতি। সেদেশের মূল বন্দরটির নিয়ন্ত্রণ ভার চীনের কাছে হস্তান্তর করা এখন সময়ের ব্যাপার। দেশটিতে আফ্রিকায় মার্কিন সামরিক বাহিনীর মূল ঘাঁটি অবস্থিত। সঙ্গত কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই পদক্ষেপে জিবুতির ওপর ক্ষুব্ধ। কিরগিজস্তান ও মালদ্বীপ বন্দর, রেল যোগাযোগ ও খনির মতো কৌশলগত সম্পদগুলি চীনের তদারকিতে ন্যস্ত করতে বাধ্য হয়েছে। মূলত উপকারভোগীদের প্রলুব্ধ করার পর তাদের ঋণের ফাঁদে ফেলে দ্রুত হাতের মুঠোয় আনার লক্ষ্য নিয়ে চীনের ঋণ প্রকল্প প্রণয়ন করা হয়েছে। চীনা ঋণের বিপরীতে উচ্চ সুদের হার গুনতে হয়। অপরদিকে ঘন ঘন সুদ-সহ ঋণ পরিশোধ করতে হয়। ফলে ঋণগ্রহীতা দেশগুলো ঋণ পরিশোধে হিমশিম খায়। এটাই হচ্ছে চীনা 'ঋণের ফাঁদ'। এ কারণে প্রতি দুই বছর পর বা তারও আগে জামানত হিসেবে ব্যবহৃত স্ট্র্যাটেজিক জাতীয় সম্পদ পুনরায় তফশিল করার প্রয়োজন পড়ে। এ ধরনের চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ পাওয়ার সুযোগ থাকায় চীনের সরকার নিয়ন্ত্রিত ব্যাঙ্কগুলি দরিদ্র দেশগুলিতে ঋণ দিতে আগ্রহী হয়ে উঠেছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, চীনা বিনিয়োগ 'ট্রোজান ঘোড়া'র মতো, যা উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলির আড়ালে জাতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোয় প্রবেশ করে। এরপর দেশটিকে 'কখনও পরিশোধযোগ্য নয়' এমন ঋণের দিকে নিয়ে যায়। যা 'ঋণের জাল' হিসেবেও বহুল পরিচিত। অন্য কথায়, সস্তায় অবকাঠামো গড়ার টোপ ফেলে ঋণ চুক্তিতে আবদ্ধ করার পর সুদ-সহ ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হওয়ায় 'ডিফলটর' হিসেবে চিহ্নিত করাই চীনা ঋণের লক্ষ্য। সময়মতো পরিশোধ না করায় ঋণ বহুগুণে বেড়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, জিবুতির কথা উল্লেখ করা যায়। চীনের কাছে দেশেটির ঋণের পরিমাণ এখন তার বার্ষিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ৮০ শতাংশেরও বেশি। অপরদিকে চীনের কাছে ইথিওপিয়ার ঋণ তার বার্ষিক আয়ের প্রায় ২০ শতাংশ এবং কিরগিজস্তানের ৪০ শতাংশ বলে ধারণা করা যায়।

পাকিস্তানও একই দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান ক্ষমতা গ্রহণ করেই 'নতুন পাকিস্তান' গড়ার এবং দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। তিনি এ লক্ষ্যে কঠোর আইন প্রণয়ন করেন এবং দুর্নীতিবিরোধী অভিযান চালান। তার এ উদ্যোগের জন্য পাকিস্তানের জনগণ তাঁকে সাধুবাদ জানিয়েছিল। কিন্তু অজ্ঞাত কারণে চীন-পাকিস্তান অর্থনৈতিক করিডোরের (সিপিসি) আওতাধীন প্রকল্পগুলিতে ব্যাপক দুর্নীতি ও অপব্যবহারের অভিযোগের বিষয়ে ইমরান খান চুপ মেরে গেছেন। পাকিস্তানে উচ্চাভিলাষী হিসেবে স্বীকৃত এই প্রকল্প চীন সরকার ও প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। পরবর্তীতে 'পানামা পেপার্স'-এ নওয়াজ শরীফকে চীনা সংস্থাগুলির কাছ থেকে বিশাল অঙ্কের অর্থ গ্রহণের কথা উল্লেখ করা হয়। এই দুর্নীতির দায়ে নওয়াজ শরীফ এখন জেল খাটছেন। প্রকৃত ঘটনা হচ্ছে চীনের মদদপুষ্ট পাকিস্তানের সর্বশক্তিমান সেনাবাহিনীই ইমরান খানকে মত পাল্টাতে বাধ্য করেছে। ধারণা করা যায়, চীনের সঙ্গে গোপন ডিলে সেনাবাহিনীর পদস্থ কর্মকর্তারাও জড়িত।

বাংলাদেশে চীনা কোম্পানিগুলো কীভাবে ব্যবসা করছে সে চিত্র তুলে ধরে সংবাদপত্র 'দ্য ডিপ্লোম্যাট' জানিয়েছে, চীনা কোম্পানিগুলো কোনো প্রকল্পের কাজ পেতে টেন্ডারে সবচেয়ে কম দর হাঁকে, কাজ পাওয়ার পর ধীরেসুস্থে কাজ শুরু করে। কিছুদিনের মধ্যে ব্যয়বরাদ্দ বাড়ানো কিংবা শর্ত পরিবর্তনের জন্য চাপ দেয়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দূতাবাসের মাধ্যমেও চাপ। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের এক শ্রেণীর সরকারি কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ীরাও এই প্রক্রিয়ায় যুক্ত থাকে। এরকম অনৈতিক কাজ অন্য কোনো দেশ থেকে হয় কিনা জানা নেই। পদ্মা সেতু থেকে কর্ণফুলি টানেল সবখানেই এই অবস্থা। অর্থাৎ এই কৌশল সরকারিভাবে অনুমোদিত। তাই দূতাবাসের সহায়তা পাওয়া যায়।

একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা বাংলাদেশের মানুষের ভুলে যাওয়ার কথা নয়। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী চীনা অস্ত্র দিয়েই ত্রিশ লক্ষ মানুষ হত্যা করেছে। চার লক্ষেরও বেশি নারী নির্যাতিত হয়েছেন, যাদের অধিকাংশই পরে আত্মহত্যার পথ বেছে নেন। বাংলাদেশ পরিণত হয় ধ্বংসস্তূপে। স্বাধীনতার পর চীন স্বীকৃতি দেয়নি, জাতিসঙ্ঘে সদস্যপদ লাভের প্রস্তাবে ভেটো দেয়। চীনের স্বীকৃতি আসে বঙ্গবন্ধু সপরিবারে নিহত হওয়ার পর। এরকম বৈরী একটি দেশ কীভাবে বাংলাদেশের পরম বন্ধুতে পরিণত হয়, তাও বঙ্গবন্ধুর দলের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে তা অবিশ্বাস্য। রাজনীতিতে স্থায়ী শত্রু কিংবা স্থায়ী মিত্র বলে কিছু নেই, একথা বাংলাদেশ আবারও প্রমাণ করলো। অর্থনৈতিক ও সামরিক খাতের সবচাইতে বড়ো মিত্র এখন চীন। আপিল বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক লিখেছেন, 'শুধুমাত্র প্রকল্প ও অবকাঠামো খাতে ঋণ ও বিনিয়োগ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ভিত্তি হতে পারে না। একাত্তরের ভূমিকা এবং বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর খুনিদের সরকারকে স্বীকৃতি দানের বিষয়টি আমরা ভুলতে পারি না।'

অর্থকে শুধু হাতিয়ার নয়, চীন বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারসাম্যও রক্ষা করে। বাংলাদেশে দুই প্রধান রাজনৈতিক শক্তি আওয়ামি লিগ ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। দুই দলের সঙ্গে সখ্য রক্ষা করে চলে চীনের কমিউনিস্ট পার্টি। এটা তাদের রাজনৈতিক কৌশল। বাংলাদেশে ১৫ আগস্ট জাতীয় শোক দিবস পালিত হয়। ১৯৭৫ সালে এদিনে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সপরিবারে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রে নিহত হন। বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া ২০০১ সালে দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর তিনি এ দিনটি তাঁর জন্মদিন হিসেবে পালন করে আসছেন। রেকর্ডপত্রে ভিন্ন ভিন্ন দিবসে খালেদা জিয়ার আরও দুটি জন্মদিন পাওয়া যায়। একটি উল্লিখিত হয় তাঁর পাসপোর্টে, অন্যটি উল্লেখ করা হয় ১৯৯১ সালে নির্বাচনে বিএনপি জয়লাভের পর খালেদা যখন প্রথম প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন তখন সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে সংবাদ মাধ্যমে ইংরেজি ও বাংলায় যে জীবনী পাঠানো হয়েছিল তাতে। অর্থাৎ সরকারিভাবেই খালেদার তিনটি জন্মদিন। শেষ জন্মদিন হিসেবে ২০০১ সাল থেকে যেটা পালন করা হচ্ছে সেটা যে নেহাতই বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার দিন আনন্দ উৎসবের জন্য অজুহাত তৈরির কথা বুঝতে কষ্ট হয় না।

গত ১৫ আগস্ট ঢাকায় চীনা রাষ্ট্রদূত খালেদা জিয়াকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়ে উপহার সামগ্রী পাঠান তাঁর বাসায়। খালেদা দুর্নীতির দুই মামলায় দণ্ডিত হয়ে সাজা খাটছেন। করোনা সংক্রমণ শুরু হওয়ার পর থেকে বর্তমানে সরকারের বিশেষ বিবেচনায় তিনি নিজের বাড়িতে অন্তরীণ আছেন। এটা জামিন নয়, শুধুমাত্র কারাগার থেকে স্থান বদল। চীনা রাষ্ট্রদূতের এই আচরণ থেকে চীন সরকার বা চীন কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান বোঝা যায়।

বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পিছনে চীনেরও হাত ছিল, এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর জিয়া ক্ষমতায় আসেন এবং চীনের বাংলাদেশে প্রবেশ শুরু হয় রাজকীয় মর্যাদায়। জিয়া বঙ্গবন্ধুর এক খুনিকে চীনে বাংলাদেশ দূতাবাসে চাকরি দিয়ে পাঠায়, চীন তাকে গ্রহণ করে। অথচ ইউরোপীয় কোনো দেশ খুনিদের সেখানে দূতাবাসে পাঠানো হলেও গ্রহণ করেনি। চীন জিয়াউর রহমানের আমলেই প্রথমে সেনাবাহিনীতে অস্ত্রশস্ত্র রপ্তানি শুরু করে। শুরু হয় ব্যবসা। বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থায়ন। ত সেই শুরু চীনকে আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি। জিয়ার পর এরশাদ, তারপর খালেদা এবং সর্বশেষ শেখ হাসিনা। গত জুলাই মাসে এক প্রতিবেদনে বাংলাদেশের 'দৈনিক ভোরের কগজ'-এ বলা হয়েছে, ২০১৮ সালে নির্বাচনের পর গঠিত নতুন মন্ত্রিসভায় পাকিস্তান ও চীন ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীরা স্থান পেয়েছেন বেশি, উপদেষ্টাদের মধ্যেও তাদের প্রভাব লক্ষ্য করার মতো।

বাংলাদেশের সংবাদ মাধ্যমেও এক বড়ো ভূমিকা রয়েছে চীনের। দু' একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বেশিরভাগ সংবাদমাধ্যমে চীনের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হতে পারে এমন খবর পরিবেশিত হয় না। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত-চীন সীমান্ত সঙ্ঘাতের সময় এটা ভালোভাবেই প্রকাশ পেয়েছে। কয়েকদিন আগে জাতীয় প্রেস ক্লাবের নোটিশ বোর্ডে চীনা দূতাবাসের একটি বিজ্ঞপ্তি লক্ষ্য করা গেছে।

এই বিজ্ঞপ্তিতে '২০২০ সিল্ক রোড গ্লোবাল নিউজ অ্যাওয়ার্ডস'-এর জন্যে লেখা কিংবা প্রতিবেদন চাওয়া হয়েছে, যার জন্য পুরস্কারের ঘোষণা আছে। এতে পাঁচটি ক্যাটেগরি রয়েছে ঃ ইন-ডেপথ রিপোর্টিং অ্যাওয়ার্ড, কমেন্টারি অ্যাওয়ার্ড, প্রেস ফটো অ্যাওয়ার্ড, ভিডিয়ো অ্যাওয়ার্ড এবং স্পেশাল কনট্রিবিউশন অ্যাওয়ার্ড। প্রত্যেক ক্যাটেগরিতে আছে একজন উইনার ও চারজন ফাইনালিস্টের পুরস্কার। প্রত্যেক উইনার পাবেন ২১ হাজার ৫০০ মার্কিন ডলার এবং চার ফাইনালিস্ট পাবেন প্রত্যেকে ৭ হাজার ২০০ মার্কিন ডলার করে। বলা হয়েছে লেখা বা প্রতিবেদন হতে হবে সেই 'বেল্ট অ্যান্ড রোড' নিয়ে। জাতীয় প্রেস ক্লাবের নোটিশ বোর্ডে এই প্রথম কোনো বিদেশি দূতাবাসের বিজ্ঞপ্তি টাঙানো হলো।

(ক্রমশ)

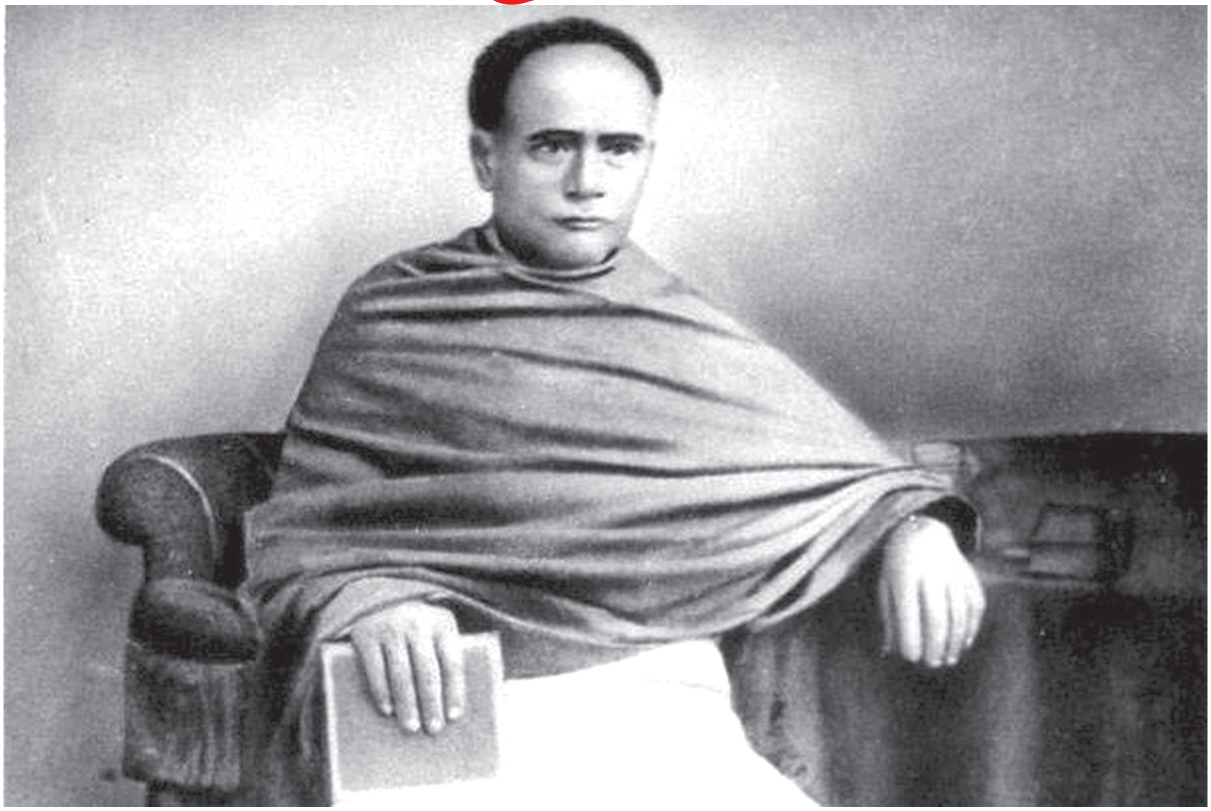

সনাতন ধর্ম ও সংস্কৃতির আধুনিক রূপকার বিদ্যাসাগর

ড. তরুণ কান্তি চক্রবর্তী

বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মের দ্বিশতবর্ষে শতকোটি আন্তরিক শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে এই নিবন্ধ শুরু করছি। বিদ্যাসাগর বড়োলোকের ঘরে জন্মাননি, জন্মেছিলেন বড়ো মানুষের ঘরে। দারিদ্রকে জয় করে তিনি বড়ো মানুষের পরিচয় দিয়েছিলেন শিক্ষাজীবন থেকে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত। দারিদ্র তাঁর গুণাবলীকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। তাই তিনি নিজগুণে একাধারে বিদ্যাসাগর ও করুণাসাগর হয়ে অনন্য ও অসাধারণ। এর মূলে ছিল সনাতন ভারতের প্রাচীন ঋষিদের পাণ্ডিত্য, প্রজ্ঞা ও কর্মোদ্যম।

বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ও প্রজ্ঞা হিন্দু ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তার সম্যক উপলব্ধি থেকে সঞ্জাত। তিনি হিন্দু বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন করার জন্য যে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন, তার স্বপক্ষে শাস্ত্রের প্রমাণ দিয়েছেন। কারণ তিনি উপলব্ধি করেন যে, রক্ষণশীল ও গোঁড়া হিন্দু সমাজ তা শুধু তাঁর কথায় মেনে নেবেন না। অধিকন্তু 'আপনি-আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও'— এই প্রবাদ বাক্যকে সার্থক করে নিজ পুত্র নারায়ণ চন্দ্রকে তাঁর পরিবারের অমতে বিধবার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করিয়েছেন। কথায় ও কাজের এমন মিল খুবই বিরল, বিশেষ করে বিধবা-বিবাহের মতো এমন স্পর্শকাতর বিষয়ে উনবিংশ শতাব্দীর রক্ষণশীল হিন্দু সমাজে। তাই তিনি বিধবা-বিবাহের জন্য 'পরাশর সংহহিতা'র আশ্রয় নিয়েছিলেন। ওই পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে, 'সত্যযুগে মানুষের মধ্যে একরকম ধর্ম প্রচলিত, ত্রেতাতে আলাদা, দ্বাপরে আরেক রকম এবং কলিযুগে অন্যরূপ ধর্ম নির্দিষ্ট (শ্লোক ২১)। কলিযুগে 'পরাশর সংহিতা'ই শ্রেষ্ঠ (শ্লোক ২৩)। রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : '১২৬০ সালের বা ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দের শেষভাগে একদিন রাত্রিকালে বিদ্যাসাগর ও আমি একত্র বাসায় ছিলাম। আমি পড়িতেছিলাম, তিনি একখানি পুঁথির পাতা উলটাইতেছিলেন। এই পুঁথিখানি 'পরাশর সংহিতা'। পাতা উলটাইতে উলটাইতে হঠাৎ তিনি আনন্দে বেগে উঠিয়া পড়িয়া বলিলেন, 'পাইয়াছি, পাইয়াছি'। আমি জিজ্ঞাসিলাম, — 'কি পাইয়াছ'? তিনি তখনই 'পরাশর সংহিতা'র সেই শ্লোকটি আওড়াইলেন,—

“নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।

পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যো বিধিয়তে।।” (বিহারীলাল সরকার, বিদ্যাসাগর, তৃতীয় সংস্করণ, পৃ. ২৫০)

উল্লেখ্য যে, ১৮৫৭ সালের ৭ ডিসেম্বর তাঁরই উদ্যোগে প্রথম বিধবা-বিবাহ হয়েছিল।

স্ত্রীজাতির দুঃখমোচনে তিনি যে সমস্ত কাজ করেছিলেন, তা ভারতীয় শাস্ত্রসম্মত। ‘ব্যাস সংহিতা’য় ১৩নং শ্লোকে বলা হয়েছে, পূর্বে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা এক দেহ দু’ভাগে ভাগ করেন। একভাগ দ্বারা পুরুষ সৃষ্ট হয়, অপরভাগ দ্বারা নারী সৃষ্টি হয়। এর প্রমাণ শ্রুতিতে আছে। এই যদি শাস্ত্রীয় বচন হয়, তবে মহিলাদের হীন করে রাখার কোনো বিষয় মেনে নেওয়া যায় না। বিদ্যাসাগর মানেননি। সনাতন হিন্দু ধর্মের যা ভালো অভিমত ও প্রথা, তা তিনি সমাজের কুরীতি দূর করার জন্য প্রয়োগ করেন। বিধবা-বিবাহ প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্র সম্মত। বহু-বিবাহ একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া হিন্ধুশাস্ত্রসম্মত নয়— এটা উপলব্ধি করে তিনি এ বিষয়ে যুদ্ধে নেমেছিলেন। বিধবাবিবাহের মতো বহুবিবাহ বিষয়ে তিনি আইন পাশ করাতে পারেননি। কিন্তু বহুবিবাহ রোধ করার জন্য ‘বহুবিবাহ’ শীর্ষক একটি বই লিখলেন এবং শাস্ত্রের উল্লেখ করে বোঝালেন যে একটিমাত্র ক্ষেত্র ছাড়া পুরুষদের বহুবিবাহ সঠিক নয়। কোন অবস্থায় একজন পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেন, এ ব্যাপারে ‘মনুসংহিতা’র একটি শ্লোকে উল্লেখ আছে যে, যখন স্ত্রী নেশাখোর হয়ে যাবে, ব্যাভিচারী হবে, স্বামীর যাবতীয় ইচ্ছার বিরোধী হবে এবং ক্রুর ও নিষ্ঠুর চরিত্রের হবে, তখন একজন পুরুষ দ্বিতীয় বিবাহ করতে পারেন। বিদ্যাসাগর হিন্দুদের গোঁড়ামি ও কুরীতির বিরুদ্ধে আজীবন লড়েছেন কিন্তু হিন্দুশাস্ত্র ও সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের কথা কখনও বিস্মৃত হননি। তদানীন্তন বেথুন স্কুলের মেয়েরা যে গাড়িতে যাতায়াত করত, সেই গাড়ির গায়ে লেখা ছিল একটি শাস্ত্রীয় বচন—

“কন্যাপবেৎ পালনীয়া
শিক্ষানীয়াতি যত্নতঃ।”

স্ত্রী শিক্ষা যে শাস্ত্রসম্মত এবং স্ত্রী শিক্ষায় উদ্যোগীরা যে শাস্ত্রসম্মত কাজ করেছেন— এটা বোঝাবার জন্যই গাড়ির গায়ে এভাবে লেখা হয়েছিল। হিন্দুজাতি যে স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে পরম যত্নশীল ছিল, বিদ্যাসাগর সেই কথাই মনে করিয়ে দেন। বিদ্যাসাগর আস্তিক না নাস্তিক— এ বিষয়ে অনেক তর্ক আছে। কিন্তু মনেপ্রাণে তিনি কিন্তু হিন্দু ছিলেন। হিন্দুশাস্ত্র সমূহে পণ্ডিত হওয়ায় হিন্দুধর্ম তত্ত্বের মূলবিষয় তিনি জ্ঞাত ছিলেন। স্নেহভাজন ডাঃ অমূল্যচরণ বসু তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে জানবার জন্য তাঁকে অনুনয়-বিনয় করেন। বিদ্যাসাগর তখন একটি বাক্যই বলেছেন, ‘গীতার উপদেশ অনুসারে চললেই ভালো হয়’।

এ প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর সম্পর্কে স্বামী বিবেকানন্দের অভিমতও উল্লেখ্য। ‘স্বামী বিবেকানন্দের বিশ্বাস, বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই ঈশ্বরের বিষয়ে বুঝেছেন। ঈশ্বরের বিষয়ে না বুঝলে তিনি আর পাঁচটা বিষয়ে কেমন করে বুঝলেন? আর পাঁচটা কী?

স্বামী বিবেকানন্দ একদিন মহেন্দ্রনাথ গুপ্তকে বলেছেন, ঈশ্বরের বিষয়ে যে বোঝেননি, সে দয়া, পরোপকার বুঝলে কেমন করে? স্কুল বুঝলে কেমন করে? কেমন করে বুঝলে যে, স্কুল খুলে ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে হবে? যে একটা ঠিক বোঝে, সে সব বোঝে।’ (শ্রীম, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, দ্বিতীয় ভাগ (কলকাতা, ১৩৬০), পৃ. ৩৮৬)। বিদ্যাসগর পূজাপাঠ, আহ্নিক, দেবস্থান, তীর্থস্থান— এইসব বিষয়ে আগ্রহ দেখাননি। কিন্তু তিনি পিতৃদেব ভব, মাতৃদেব ভব, অতিথিদেব ভব— পরম বিশ্বাসের সঙ্গে মানতেন। হিন্দুশাস্ত্র কথিত এগুলি হলো— ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য ও অক্রোধ। এছাড়া আরেকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য যে, তাঁর যাবতীয় চিঠিপত্রের উপরে লেখা থাকতো ‘শ্রীহরিঃ শরণম্।’ ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে তিনি কি কথাগুলি লিখতেন? উত্তর অবশ্যই ‘না’।

ভারত পথিক রাজা রামমোহন রায়ের পরে একমাত্র বিদ্যাসাগরকেই পাওয়া যায় যিনি যুক্তিবাদী। বিদ্যাসাগরের প্রতিটি কাজই মানবিকতা ও লোকহিত— এই দুটি প্রেরণা থেকেই ঘটেছে। বিদ্যাসাগর অনন্য এই কারণেই যে, তিনি দেখিয়েছেন বাস্তবমুখীনতা ও হৃদয়বতার সহাবস্থান সবসময়ই সম্ভব— যদি ধর্মপথে থাকা যায়। পাশ্চাত্য চিন্তা প্রণালীতে সাফল্যটাই প্রধান, কীভাবে এসেছে তা নয়। প্রাচ্য চিন্তা প্রণালী কিন্তু আলাদা, সাফল্য অবশ্যই চাই, তবে অধর্ম পথে নয়। এই কারণেই তিনি কখনও কোনো কাজে অধর্ম পথ অবলম্বন করেননি।

পূর্বেই বলা হয়েছে, বিদ্যাসাগর কুরীতিমুক্ত এবং তাঁর কাজ মানবিকতা ও লোকহিতের প্রেরণায় সিক্ত। ১৮৯১ সালের ২৪ আগস্ট ‘Indian Nation’ যথার্থই লিখেছে, “Vidyasagar will be remembered more for his charity, his educational work, his literary work and his reforming spirit, than for the single legislative measure he succeeded in getting passed.”

বিদ্যাসাগরকে বলা হয়ে থাকে বাংলা গদ্যের জনক। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে, ঈশ্বরচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের দ্বার উদ্ঘাটন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন যে, ঈশ্বরচন্দ্রের আগে কেউ এত ভালো বাংলা গদ্য রচনা করতে পারেননি, পরেও পারেননি। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাসাগর ও মাইকেল মধুসূদন দত্তের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। প্রমথনাথ বিশী বলেছেন, ‘পদ্যে মধুসূদন যাহা করিয়াছেন, গদ্যে তাহা করিয়াছেন বিদ্যাসাগর। তিনি গদ্যছন্দের মধুসূদন।’ (প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, বিদ্যাসাগর রচনাসম্ভার, (কলকাতা ১৯৫৭, পৃ. ১))

বিদ্যাসাগর করুণাসাগর। দীনদুঃখীদের প্রতি তাঁর করুণাবর্ষণ অসীম পরোপকারের ইচ্ছা থেকে উৎসারিত

হয়েছিল। রমেশচন্দ্র দত্ত সুবলচন্দ্র মিত্রের ‘ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর’ পুস্তিকার ভূমিকার একজায়গায় লিখেছেন, “The princely income derived from his books, was devoted to the relief of suffering and disposses; hundreds of poor widows awed him their maintenance; hundreds of helpless orphans owed him thin education.” মধুসূদন বিদেশে গিয়ে যখন প্রচণ্ড অর্থাভাবে ভুগছিলেন তখন বিদ্যাসাগরের কাছে অর্থ সাহায্য চাইলেন। বিদ্যাসাগরের কাছে টাকা পাওয়ার ব্যাপারে তিনি এতটাই নিশ্চিত ছিলেন যে, নিরাশাগ্রস্ত স্ত্রীকে বললেন, “The man to whom I have appealed has genius and wisdom of an ancient sage, the energy of an Englishman and the heart of a Bengali mother.”

জনহিত ও শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর কুরীতিমুক্ত হয়ে কাজ করেছেন। প্রথমাবস্থায় কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য কোনো ছাত্র ভর্তি হতে পারত না। ১৮৫১ সালের ৭ জানুয়ারি Council of Education-এর সেক্রেটারি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাড়া অন্য ছাত্রদের ভর্তির বিষয়ে বিদ্যাসাগরের কাছে রিপোর্ট চাইলেন। উত্তরে বিদ্যাসাগর ১৮৫১ সালের ২৮ মার্চ Council of Education-এর সেক্রেটারিকে একখানা চিঠিতে লিখলেন, “I see no objection to the admission of other castes than Brahmins and Vaidyas or in other words, different orders of shudras to the Sanskrit College.” বিদ্যাসাগরের রিপোর্টে কাউন্সিল খুশি হয়। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, শূদ্র সবাই সংস্কৃত কলেজে পড়ার সুযোগ পায়। আজও সেই সুযোগ বহাল আছে।

সংস্কৃত কলেজের উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি এডুকেশন কাউন্সিলের সেক্রেটারি ড. ময়েটকে ১৮৫৩ সালে একটি রিপোর্টে উল্লেখ করেছেন, “what we require is to extend the benefit of Education to the mass of the people. Let us establish a number of Vernacular Schools, let us prepare a series of Vernacular classbooks on useful and instructive subjects, let us raise up a hand of men qualified to undertake the responsible duty of teachers and the object is accomplished.”

বিদ্যাসাগর তাঁর সময়ের চিন্তাধারার থেকে অনেক এগিয়ে ছিলেন। সে যুগেই আধুনিকতার প্রবর্তন করেছিলেন। তাঁর আধুনিক চিন্তাধারা স্ত্রীজাতির দুঃখমোচন, শিক্ষাসংস্কার, সাহিত্যরচনা ইত্যাদি বিষয়ে লক্ষ্য করা যায়। প্রাচ্যের প্রজ্ঞার সঙ্গে পাশ্চাত্যের কর্মোদ্যমের এমন সুষম বিকাশ অনন্য। তিনি জীবনের শেষদিকে নিজের জীবনের অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, “এদেশের উদ্ধার হইতে বহু বিলম্ব আছে, পুরাতন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি বিশিষ্ট মানুষের চাষ উঠাইয়া দিয়া সাতপুরু মাটি তুলিয়া ফেলিয়া নূতন মানুষের চাষ করিতে পারিলে তবে এদেশের ভালো হয়” (চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বিদ্যাসাগর’, ষষ্ঠ সংস্করণ, পৃ. ২৯৪)। ভারতের ঐতিহ্য পরম্পরায় গভীর বিশ্বাসী ও কুরীতি বিরোধী যুক্তিবাদী বিদ্যাসাগর তাঁর প্রতিটি কাজে বড়োমানুষের পরিচয় রেখে গেছেন। তাই তিনি অনন্য ছিলেন, পরবর্তী সময়েও থাকবেন।

(লেখক জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক)

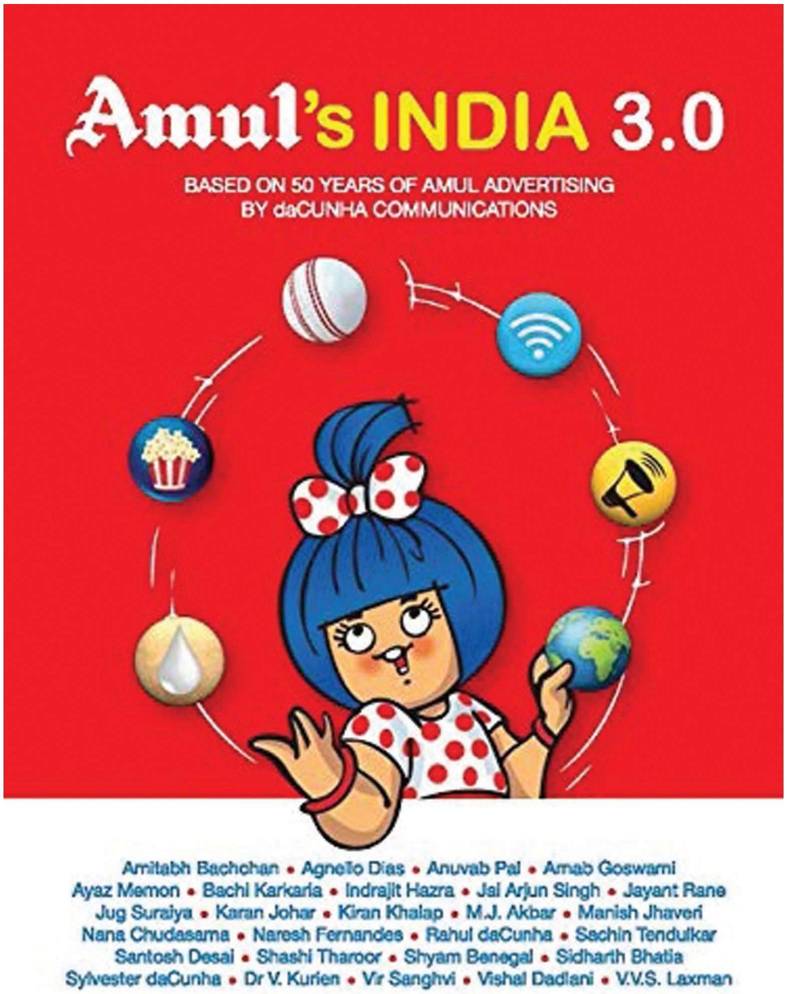

গুরু গ্রন্থসাহেব একটি পর্যালোচনা

রুদ্রপ্রসাদ

বিশ্বের মহান গ্রন্থগুলির মধ্যে গুরু গ্রন্থসাহেব অনন্য। গুরু গ্রন্থসাহেব গুরুবাণী হিসেবে পরিচিত। এর অর্থ, 'গুরুর মুখ থেকে 'স্বরের শব্দ' হিসেবে বিবেচিত হয়। ঈশ্বরের মুখ থেকে নিঃসৃত শব্দই গুরুমুখী বিদ্যা হিসেবে পরিচিত। গুরু গ্রন্থসাহেব ১,৪৩০ পৃষ্ঠা সংবলিত। যার প্রতিটি পৃষ্ঠার, প্রতিটি অনুলিপিতে গুরুর দ্বারা কথিত শব্দ রয়েছে। গুরু গ্রন্থসাহেব শুধুমাত্র শিখগুরুদের নয়, বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির বিদ্বানদের বহু স্তব, কবিতা ও অন্যান্য রচনা সংকলন। কোনো জীবিত ব্যক্তির চেয়ে সর্বোচ্চ আধ্যাত্মিক কর্তৃত্ব এবং শিখ পন্থের প্রধান হিসেবে গুরুমুখী ভাষায় রচিত গুরু গ্রন্থসাহেবকে বিবেচনা করা হয়। এটি এমন একটি গ্রন্থ যা কেবলমাত্র শিখেদের কথা নয়, অন্য বিশ্বাসের সঙ্গে জড়িত লোকদের কথাও বলা হয়েছে। শ্রীগুরু গ্রন্থসাহেবের প্রকাশ উৎসব পঞ্জাবি বর্ষপঞ্জির ষষ্ঠ মাস, ভাদনের ১৫ তম (অবাবস্যা)-য় অনুষ্ঠিত হয়। অর্থাৎ পশ্চিমি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী আগস্ট বা সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হয়।

পঞ্চম শিখগুরু অর্জুনদেব অনুভব করেছিলেন যে, শিখ গুরুদের স্তবগুলো যথাযথভাবে সংকলন করা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে তিনি শ্লোকগুলি সংগ্রহ করতে শুরু করেন। আসল পাণ্ডুলিপির সংগ্রহের উদ্দেশ্যে তিনি ভাই পাইয়ার, ভাই গুরুদাস ও বাবা বুদ্ধ বৌদ্ধজীয়ের মতো সন্তদের সারা দেশজুড়ে প্রেরণ করেছিলেন। গুরু অর্জুনদেব স্বয়ং পূর্ববর্তী গুরুদের পরিবারকে দর্শন করার জন্য গোয়িন্দওয়াল, খাদুর ও করতারপুরে ভ্রমণ করেছিলেন। গুরু অর্জুনদেব গুরুদের পাণ্ডুলিপিগুলি মোহন (গুরু অমরদাশের পুত্র), দাদু (গুরু অঙ্গদের পুত্র), শ্রী চাঁদ (গুরু নানকের পুত্র) থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। এইভাবে হয়েছিল গুরু গ্রন্থসাহেবের মূল সংস্করণের সংকলন।

গুরু নানকজীর অনেক স্তোত্র ও প্রার্থনা গুরু অঙ্গদ ও গুরু অর্জুনদেবজীর দ্বারা রক্ষিত ও অনুসরণ করা হয়েছিল। এই সংগ্রহটি আদিগ্রন্থ নামে পরিচিত। আদি গ্রন্থটি ১৬০৪ সালে সমাপ্ত হয়েছিল এবং স্বর্ণমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আদি গ্রন্থে কবির, রবিদাস, নাম দেব ও শেখ ফরিদ-সহ ৩৬ জন হিন্দু ও মুসলমান সন্তের নাম আছে। আদি গ্রন্থের আসল অনুলিপিটি বিভিন্ন ভাষায় এবং বিভিন্ন লেখকের দ্বারা প্রতিফলিত হয়েছে। গুরু গ্রন্থসাহেবের মূল সংস্করণ পাওয়া যাবে মহারাষ্ট্রের নান্দেড় শহরে। ১৭০৮ সালে আদি গ্রন্থ গুরুগ্রন্থ সাহেবে পরিণত হয়েছিল। ঘোষণা করেছিলেন গুরু গোবিন্দ সিংহ। এরপর গুরু গ্রন্থসাহেব শিখদের চিরন্তন গুরু হয়ে ওঠেন। ১৭০৮ সালে গুরু গোবিন্দ সিংহের বলিদানের পরে বাবা দীপ সিংহ ও ভাই মণি সিংহ বিতরণের জন্য গুরু গ্রন্থসাহেবের বহু কপি প্রস্তুত করেছিলেন। মহারাষ্ট্রের নান্দেড় শহর ছাড়াও অন্যত্র গুরু গ্রন্থসাহেবের সংস্করণের অনুলিপিগুলি পাওয়া যায়।

গুরু গ্রন্থসাহেবের প্রথম শব্দ হলো 'মন্ত্র'। এটি শিখ পন্থের স্বীকৃতির বিবৃতি। এই গ্রন্থটিতে একেশ্বরবাদের কথা বলা হয়েছে। গুরু গোবিন্দ সিংহ গুরু গ্রন্থসাহেবকে স্থায়ী গুরুর মর্যাদা উপস্থাপন করেন এবং ১৭০৮ সালে এটিকে 'শিখদের গুরু' উপাধিতে ভূষিত করেন। গুরু গ্রন্থসাহেবকে গুরু গোবিন্দ সিংহ তার পরবর্তী গুরু হিসেবে ঘোষণা করেন এবং শিখদের আদেশ করেছিলেন গুরু গ্রন্থসাহেবকে তাদের পরবর্তী এবং চিরস্থায়ী গুরু হিসেবে বিবেচনা করতে। তিনি বলেছিলেন, 'সব শিখন কো হুকুমহই গুরু মুনিও গ্রন্থজী'। অর্থাৎ সব শিখকে গুরু হিসেবে গ্রন্থকে বিবেচনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছে।

গুরু গোবিন্দ সিংহ নিম্নলিখিত শব্দগুলিতে আদেশ করেন :

'অগয়া ভাই আকাল কি তাবি চালাও পন্থ।'

অর্থাৎ অমর সত্তার আদেশে পান্থ তৈরি হয়েছিল।

'সব শিখন কো হুকুম হ্যায় গুরু মুনিও গ্রন্থ।'

অর্থাৎ সমস্ত গ্রন্থকে তাদের গুরু হিসেবে গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

'গুরু গ্রন্থজী মনুও পরগত গুনান হি দেহ।'

অর্থাৎ গুরু গ্রন্থকে গুরুদের প্রতিমূর্তি হিসেবে বিবেচনা করুন।

'জো প্রভুকো মিলবো চাহু খোঁজ শব্দ মেইন লে।'

অর্থাৎ যারা ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করতে চায়, তার স্তবগুলিতে তাকে খুঁজে পেতে পারে।

'রাজ কারেগা খলসা আকি রাহি নাকো।'

অর্থাৎ খাঁটি শাসন করবে, আর অশুচি হবে না।

'খোয়ার হো সব মিলন কে বাচে স্মরণ জো হো।'

অর্থাৎ বিচ্ছিন্নদের একত্রিত করে সমস্ত ভক্তকে রক্ষা করা হবে।

১৪৩০ পৃষ্ঠা সংবলিত গুরু গ্রন্থসাহেব, যার পৃষ্ঠাগুলো দিগন্তের সমান্তরালে লেখা। প্রতি পৃষ্ঠায় সাধারণত ১৯ লাইনের পাঠ্য আছে। শিরোনাম যুক্ত পৃষ্ঠাগুলোতে (একটি নতুন সুরের শুরু) ১৯ লাইনের চেয়ে কম সারির মোট সংখ্যা ২৬৮৫২, মোট শব্দ ৩৯৮৬৯৭। 'হরি' শব্দটি ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়েছে। কোনো বিরাম চিহ্ন ব্যবহৃত হয়নি।

ছয় শিখ গুরু, প্রথম পাঁচ গুরু (গুরু নানক দেব, গুরু অঙ্গদ দেব, গুরু অমরাদস, গুরু রামদাস, গুরু অর্জুন দেব) এবং গুরু তেগবাহাদুর।

গুরু গ্রন্থসাহেবের মধ্যে গুরু নানকদেব (৯৭৪ শব্দ এবং শ্লোক), গুরু অঙ্গদদেব (৬২ শ্লোক), গুরু অমরদাস (৯০৭ শব্দ ও শ্লোক), গুরু রামদাস (৬৭৯ শব্দ এবং শ্লোক)।

ভট্টরা ষোড়শ শতাব্দীতে বসবাসকারী একদল সংগীতজ্ঞ ছিলেন। এরা সকলেই ছিলেন আলেম, কবি ও গায়ক। (ভাট কাল, ভাট কালশেহার, ভাট তাল, ভাট জলুপ, ভাট জল, ভাট কিরাত, ভাট সাল, ভাট বাহিল, ভাট নল, ভাট ভিখা, ভাট জালান, ভাট কাস, ভাট জেন্ড, ভাট সেবক, ভাট মথরা, ভাট বাল ও ভাট হরবানস)।

১৫ ভগবত (কবির, নামদেব, রবিদাস, শেখ ফরিদ, ত্রিলোচন, ধনা, বেনি, শেখ ভিকান, জয়দেব, সুরদাস, পরমানন্দ, পিপ্পা, রামানন্দ, সাধনা ও সায়)।

গুরু গ্রন্থসাহেব পাঠ শুরু করা হয় জিপসি নামে পরিচিত একটি বাণী দিয়ে। পরে সংগীতের কম্পিজিশান হিসেবে প্রতিটি বিভাগ পুনরায় শুরু করা হয়। এই রাগগুলির প্রত্যেকটির মধ্যে গুরুদের বাণী কালক্রমিক ভাবে উপস্থাপিত হয়। তারপর ভগবতগণ ৩২ ৩২ রাগ অনুসরণ করে। রাগমালা নামে একটি বিভাগ গুরু গ্রন্থসাহেব পূর্ণ করে।

গুরু গ্রন্থসাহেব যে সময় সংকলন করা হচ্ছিল, সেই সময় কিছু লোক গুজব ছড়িয়ে ছিলেন এবং মুঘল শাসক জাহাঙ্গিরের কানে তুলেছিলেন যে, গুরু গ্রন্থসাহেব এবং গুরু বাণী মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ প্রচার করছে। এতে জাহাঙ্গির ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং গুরু অর্জুনদেবকে গুরু গ্রন্থসাহেবের পাণ্ডুলিপি কিছু স্তোত্র মুছে ফেলতে নির্দেশ দেন এবং দু'লক্ষ টাকা জরিমানা জারি করেন। গুরু অর্জুনদেব তা করতে এবং জরিমানা দিতে অস্বীকার করেন। ফলস্বরূপ তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়।

গ্রন্থসাহেব প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ হয় ১৮৭৭ সালে। এর্নস্ট ট্রুম্প এটা অনুবাদ করেন। তবে এই অনুবাদ ধর্মগ্রন্থের প্রকৃত সারবত্তাকে স্পর্শ করতে পারেনি। ম্যাক্স আর্থার ১৯০৯ সালে তা 'দি শিখ রিলিজিওন' নামক গ্রন্থে চোখে আঙুল দিয়ে তা দেখিয়ে দেন। বাংলা ভাষায় বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গুরু নানকের দুটি শ্লোকের অনুবাদ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ দত্ত গদ্য এবং কিরণচাঁদ দরবেশ বুদ্ধির মাধ্যমে আরও কয়েকটি অংশের অনুবাদ করেন।

শিখ ধর্ম হলো সংস্কৃত 'শিষ্য' বা 'শিক্ষা' থেকে উৎপন্ন। এই ধর্মের মূলকথা হলো 'সর্বেশ্বরবাদ'; আর এই বিশ্বাস এমন এক বিশ্বাস যা মহাবিশ্বকে ঈশ্বর রূপে গণ্য করে। অর্থাৎ আমাদের পারিপার্শ্বিক সমস্ত জড় বা জীবিত যাই উপাদান থাকুক না কেন তার মধ্যে জীবনের অস্তিত্ব বর্তমান। তারা একক ঈশ্বরের এই জন্যই বিশ্বাসী নয়। সেওয়া সিংহ কনসির মতে— 'শিখ ধর্মের কেন্দ্রীয় শিক্ষা হলো ঈশ্বরের একত্বের তত্ত্বে বিশ্বাস'। কেবল শিখরা বিশ্বাস করেন— 'সকল ধর্মমত সমভাবে সঠিক এবং নিজে নিজ মতাবলম্বীদের আলোকিত করতে সক্ষম'। গুরু নানকদেব সত্য, বিশ্বাস, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও বিশুদ্ধতায় পরিপূর্ণ সক্রিয়, সৃজনশীল ও ব্যবহারিক জীবনের উপর গুরুত্ব প্রদান করেছেন। তাই তাঁর পথ 'সত্য অনুভবের চেয়ে বৃহত্তর কিছুই নেই। সত্যময় জীবন বৃহত্তর নামমাত্র'। এই ধর্মে কাজ বা লিঙ্গের ভিত্তিতে বৈষম্যের কোনো স্থান নেই। ব্রহ্মচর্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস এই এই চার প্রথা মধ্যে গার্হস্থ্য জীবন উদযাপনে তারা উৎসাহ প্রদান করেন।

'ইক ওঙ্কার' বা 'এক চিরন্তন' বা 'সর্বব্যাপী সত্তা' তাঁদের ঈশ্বর ধারণা। গুরু গ্রন্থসাহেবের প্রথম চরণে উল্লিখিত মূল মন্ত্র এবং তার নির্দিষ্ট রাগ বাংলা করলে দাঁড়ায় : 'কেবলমাত্র এক সর্বব্যাপী সত্তা আছে। সত্য হলো এঁর নাম। সকল সৃষ্টিতে তিনি বিরাজমান, তাঁর ভয় নেই, তার ঘৃণা নেই, তিনি নামহীন ও সর্বজনীন ও স্বকীয়, জ্ঞান ও শিক্ষার সন্ধান করলে তুমি এঁর সন্ধান পাবে।'

গুরু গোবিন্দ সিংহ মনে করেন মানবজীবন সৌভাগ্যের, তাই এখনও মূল্যবান জীবনকে কাজে লাগানো একান্ত কর্তব্য। শিখ ধর্মে কর্ম বলতে বুঝি— 'ঈশ্বরের করুণা ধারণার দ্বারা গৃহীত'। ঈশ্বরকে উপলব্ধি করতে তাই মায়া পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়, মানুষের সেবাই 'সৎসঙ্গ' রূপে বর্ণিত। গ্রন্থসাহেব এইরূপ দার্শনিক উপলব্ধি আমাদের চিত্তকে পবিত্র করে।

এখন তো আমাদের আরও একটি বিষয় স্পষ্ট করে যে, মানব জীবনের লক্ষ্য হলো অকালের সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন। এই যোগ সাধন সম্ভব অহংকে পরাভূত করে। এই অহং-এর বিনাশ সাধিত হয় সেবা এবং দাতব্য কার্যের দ্বারা। এই ধর্মে সেবা তিন প্রকার : (১) 'তন' বা দৈহিক সেবা। (২) 'মন' বা মানসিক সেবা এবং (৩) 'ধন' বা আর্থিক সেবা। তাই আমরা লক্ষ্য করি শিখ গুরুদ্বারগুলিতে খাবার বণ্টন করা হয়, দান করা হয়, সমাজসেবামূলক কাজ ও অন্যান্য সেবার মধ্যে সকলে যুক্ত থাকেন।

প্রতিটি ধর্মগ্রন্থই আমাদের মানুষ হবার মন্ত্রে দীক্ষিত করে তোলে। গ্রন্থসাসেবও তার ব্যতিক্রম নয়। ■

কৃষিকাজে আত্মনির্ভরতার দু'চার কথা

ড. কল্যাণ চক্রবর্তী

সকালে ভেষজ, বিকেলে বেলপানা, ঘোল, তরমুজের রস। কয়েক বছর আগে কিছুদিন ব্যাঙ্গালুরুর ভেটেরিনারি কলেজ ক্যাম্পাসে ছিলাম। রোজ সকালে একজন ঠেলাওয়ালা স্টিলের কয়েকটি জারে নানান ভেষজ বাটা ক্বাথ ভরে আসতেন। মর্নিংওয়াক সেরে বহু মানুষ সেখানে জমা হতেন। হাতল দেওয়া মাপনিতে নানান দ্রবণ তুলে তুলে কাগজের কাপে দিতেন তিনি। ভেষজ রসের প্রতি কাপের দাম ১০ থেকে ৩০ টাকা। জারে থাকতো নিমপাতা, থানকুনি, ত্রিফলা, তুলসী, কুলেখাড়া, ভুঁই আমলা, জামের বীজ, শুষনি শাক, কুলথ কলাই নানান জিনিস। স্থানীয় মানুষ বললেন, 'তাঁর বাড়ি গিয়ে যাচাই করেছি আমরা, পরিচ্ছন্নতা দেখে এসেছি। আমরা রোজ খাই।' আমিও খেতে শুরু করলাম। সাতদিন ছিলাম, অম্বল-গ্যাস, মাথাব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য, নিদ্রাহীনতা বুঝিনি। আমার বিশ্ববিদ্যালয়ে মেডিসিনাল প্ল্যান্ট বিষয়ে অনেকে জানতে আসেন, কেউ ট্রেনিং নিতেও আসেন, চারার খোঁজ নিতে আসেন। আমি তাদের দেখা হলেই আবেদন করেছি,

নিকটবর্তী শহরে বা গঞ্জের হাটে ভেষজ দ্রবণ নিয়ে বসা যায় কিনা। মনে হয় না কেউ করেছেন, করলে ভালো।

অনেক কৃষক পরিশ্রম করতে চান না। বাংলায় একটি প্রবাদ আছে, 'কুঁড়ে কিষান অমাবস্যা খোঁজে।' এখনকার কৃষকেরা চায় ডাবর, বৈদ্যনাথ, পতঞ্জলি, হিমালয়ান ড্রাগস প্রভৃতি ভেষজ পণ্য নির্মাতারা কৃষকের জমি থেকে ফসল কিনে নিয়ে যাবে। তা কি সবসময় হয়? তাছাড়া সত্যিই তো, এ রাজ্য ভেষজ কেনাবেচার জেলা জুড়ে বাজার গড়ে ওঠেনি তেমন। চাষিরা ভেষজ ফলাতে চান। কিন্তু বাজার নেই বলে দৌড় লাগান। করোনা পরিস্থিতিতে ভেষজের উপর নির্ভরতা ও ব্যবহার বেড়েছে। নানান পণ্যের বেচা-কেনা বেড়েছে কয়েকমাসে। ভেষজ চাষ, সংগ্রহ, প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন বাড়বে, তার সুযোগ নিতে হবে স্থানীয়ভাবে। স্বনির্ভরতার প্রচুর সুযোগ এখানে। বেঙ্গালুরুর সেই ভদ্রলোক সকালে ভেষজ রস ও বিকেলে বিক্রি করতে আসতেন ঘোল, তরমুজের রস, বেলের পানা ইত্যাদি। থাকতো বেলের মোরব্বা, আমলকির মোরব্বা প্রভৃতি।

জৈবিক ফসলের বিপুল সুযোগ : জৈবিক চাষ করে সেই ফসল গ্রাম থেকে সরাসরি শহরের কোনো আউটলেটে বিপণন করার প্রচুর সুযোগ আছে। শহরগুলির জন্য দত্তক জৈবিক গ্রাম গ্রহণ করা দরকার। নিবন্ধীকৃত খদ্দেররা যেন সারা বছর ফসলের জোগান ঘরে বসেই পান। মাঝে কোনো মিডলম্যান নয়, উৎপাদক ও ভোক্তার সরকারি সংযোগ থাকে। সপ্তাহের দুটি দিন গ্রাম থেকে পাটের ব্যাগে ভরে নানান সবজি সম্ভার শহরে আসবে। অগ্রীম একটি বাজারের টাকা নিয়ে রাখবেন শহরের দু'এক কর্মী, যাতে বাজার ফেরত না যায়। শহরে এক বা একাধিক জায়গায় শাকসবজি, ফলমূল, মশলাপাতি অন্যান্য পণ্য বিক্রি

হবে। সবই তৈরি হবে জৈবিক পদ্ধতিতে। রাসায়নিক সার, কীটনাশক, ছত্রাকনাশক ব্যবহার না করে। এই জিনিসের দাম বাজারে বেশি। চাষীফসল চাষ করে বেশি দাম পাবে। এই রকম ক্লাস্টার মার্কেটে মধ্যসত্ত্বভোগী না থাকলে ক্রেতার পক্ষেও খুব বেশি দাম বহন করতে হবে না। তারা নিরাপদ ফসল পাবেন, রোগ ব্যাধির প্রকোপ কমে যাবে। এক একটি ক্লাস্টারে ২০০টি পরিবারকে যুক্ত করতে পারলে প্রতি ক্লাস্টারে ১/২ জন কর্মীর জোগান থাকলে গ্রামের মানুষ দ্বারা শহরে পাঠানো হলে বাড়ি বাড়ি পৌঁছে মাসে দশ বিশ হাজার টাকা রোজগার করতে পারবেন। সপ্তাহে দু'দিন তিনি ক্রেতার বাড়ি সবজিফল পৌঁছে দেবেন।

একইভাবে মেডিসিনাল মিল্ক, অর্গানিক মিল্ক, মেডিসিনাল মিল্ক প্রোডাক্ট, অর্গানিক ফিস, অর্গানিক মিট, অর্গানিক চিকেন ইত্যাদির বাজার আছে। Unfelt need-কে Fell need-এ পরিণত করা কেবল সময়ের ও উদ্যোগের অপেক্ষা। মেডিসিনাল মিল্কটি কী? গ্রামবাঙ্গলার একটি প্রবাদ হলো 'গাই গোরুর মুখে দুধ'। মুখে তো আর দুধ হয় না। ভালো পুষ্টিকর খাবার গোরুর মুখে তুলে দিতে হয়, তাতে দুধের উৎপাদন ও গুণমান বাড়ে। দেশি গোরুকে নানান ভেষজ পাতা, ফুল, ফল নিয়মিত গোখাদ্য হিসেবে খাইয়ে তার দুধ কেবল খাদ্য থাকে না, হয়ে যায় পথ্য ও ওষুধ। এমন কৃষি বন Agroforestry তৈরি করতে হবে যাতে আমলকী, হরিতুকি, বহেড়া, সজনে-সহ নানান বৃক্ষ গুল্ম ও বীরুৎ ভেষজ লাগানো যায়। পরিমাণ মতো মেডিসিনাল ফডার/ ফোরেজ গোরুকে খাওয়ালে এই দুধের দাম বাজারের চাইতে দুই তিন গুণ বেশি দামে মানুষ কিনবে। কৃষক পরিবার নিজেও পুষ্টিলাভ করবে। গ্রামে ছাগল পালন, শহরে নগরে ঝটকা মাংসের দোকান, আত্মনির্ভরতার ক্ষেত্রে ব্ল্যাকবেঙ্গল গোটের ঝটকা মাংসের চাহিদাকে পুঁজি করতে হবে। চারিদিকে হালাল মাংসের পাশে মানুষের ঝটকা মাংসের ব্যাপক চাহিদা পূরণ করতে হবে। নিকটবর্তী গ্রামগুলিকে জৈবিক পদ্ধতিতে বিশেষ ব্যবস্থায় ছাগপালন হোক। অল্প জমিকে দুই চারটি ভাগে ভাগ করে বেড়া দিয়ে স্বাভাবিক ঘাস বা পশুখাদ্য চাষ হোক। মাথায় থাকবে দ্বিবেড়া সারি Double hedge Row করে বারোমাসি কাঁঠাল গাছ বা বারোমাসি আম গাছ। তার পাতাও প্রয়োজনে খাওয়ানো যাবে। জমিতে কোনো রসায়ন ব্যবহার করা যাবে না। ছাগলকে বাইরের খাবার নয়, মিশ্র খামার করে স্বাবলম্বী হতে হবে। নিজের জমির অবশেষ, বর্জ্য একটুও ফেলা যাবে না। ছাগল ভেড়ার মাংসে রেসিডুয়াল টক্সিসিটি থাকবে না। এই মাংস বেশি করে বিকোনোর উদ্যোগ নিতে পারেন। ছাগল পালন থেকে খামারিদের লাভ বাড়ুক। কৃষি-পরিবেশ পর্যটন গড়ে উঠুক দিকে দিকে, কর্মসংস্থানের নতুন ভাবনা হতে পারে Agro-eco tourism, যাকে ডাকতে পারি–– 'শিশির বিন্দু পর্যটন' নামে, এটাই কৃষি-পরিবেশ-পর্যটন। বাংলা সাহিত্যে এর উদাহরণ আছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় পাই, 'বহুদিন ধরে বহু ক্রোশ দূরে/বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে।/ দেখিতে গিয়াছি পর্বতমালা, /দেখিতে গিয়াছি সিন্ধু।/ দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া,/ ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া/ একটি ধানের শীষের উপর/একটি শিশির বিন্দু।' পশ্চিমবঙ্গে শিশির বিন্দুর সৌন্দর্য দেখবার বহু মডেল কেন্দ্র হোক। সমস্ত কৃষি জলবায়ু অঞ্চলেই এটা হতে পারে অসংখ্য। এখানে এত ভূ-প্রকৃতির বৈচিত্র্য, পাহাড়, টিলা, নদী, জলা, জঙ্গল— তা ব্যবহৃত হোক।

নতুন শিক্ষানীতিতে Summer Trip, Summer Camp-এর কথা বলা হয়েছে। আগামীদিনে বহু ছাত্র-ছাত্রীকে নিয়ে যাওয়া হবে। তার পরিকাঠামো এখনই করা হোক, এইভাবে বেসরকারি সরকারি আধা সরকারি ভাবে তৈরি হোক নানান জায়গায়। কৃষিভূমি, সবুজ অঞ্চল, জলাভূমির পাখি, অসংখ্য প্রজাপতি, সবুজ প্রান্তর, চারণ ভূমি, লেপাপোঁছা সাঁওতাল কুঠির, ভেতরে পর্যটকদের আধুনিক ব্যবস্থা থাকবে। থাকবে Herbal Garden, Butterfly Garden, Boating facilities, শালুক পদ্মে ভরা পুকুর, পাখিরালয় Bird Watch Centre। প্রয়োজন Folk Tourism-এর বন্দোবস্ত, বনবাসী, গিরিবাসী সংস্কৃতির বাণিজ্যায়ন, নাচগান, স্থানীয় খাবার, বনবাসী শিল্প সামগ্রীর কেনা-বেচা। পটচিত্র, বাঁশ ও বেতের কাজ, ডোকরা, মাটির পুতুল, মুখোশ শিল্প। 'সকল দেশের রানি, সে যে আমার জন্মভূমি'— এই গানের ভূমি দেখতে, জলা-জঙ্গল দেখতে, সাজানো গোছানো পর্যটন গড়লে প্রকৃতিবিলাসী মানুষ আসবেই। তাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এলাকায় লোকশিল্প, গ্রামীণ শিল্প বিকাশ লাভ করবে। মডেল হোক এই ব্যাপারে।

ফসল প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে উঠুক। Food Processing Industry যথাসম্ভব বাড়ুক। হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে অনেক ভরতুকি পাওয়া যায়। বাড়ুক নানান ফলের আচার, চাটনি, মোরব্বা, সিরাপ, জ্যাম, জেলি, নানান সবজির শুকনো প্যাকেট। তাতে স্থানীয় ফল, সবজি থাকা উচিত। এসব যেন জৈবিক পদ্ধতিতে চাষ হয়। স্থানীয় শিক্ষিত যুবকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে একত্র করতে হবে। ভারতীয় কিষান সঙ্ঘের কার্যকর্তারা এসব কাজ করে দেখাক। গত বছর বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেশ কয়েকশো কার্যকর্তাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। তারা স্থানীয়ভাবে এগিয়ে আসুক। নার্সারি ব্যবসা, চারা কৃশলতা ব্যাপক মানুষের কর্মসংস্থান করে দিতে পারে। টিস্যুকালচার ল্যাবরেটরি তৈরির জন্য সরকারি সহায়তা আছে হর্টিকালচার ডিপার্টমেন্টে। জেলা ও মহকুমা হর্টিকালচার অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। টবে রকমারি ফলের গাছ, শ্রীময়ী গাছ, মেডিসিনাল প্ল্যান্ট, মশলার গাছ, সবজি গাছের ট্রে ভালো দরে বিকোয়। দু' স্কোয়ার ফুট মাটির ট্রেতে ঘন করে জৈবিক পদ্ধতিতে চাষ করা এক মাসের ধনেপাতা বিক্রি হয় ১০০ টাকায়।

বাগান রচনার মাধ্যমে কর্মসংস্থান : পুষ্টি বাগান তৈরির জন্য স্বসহায়ক একটি দল তৈরি করে শিখিয়ে পড়িয়ে দিলে, তারা শহর জুড়ে যাদের বাড়ির সঙ্গে এক চিলতে জমি আছে, পূর্ব নির্ধারিত টাকায় চুক্তিবদ্ধ হয়ে এদের দ্বারা সবজি, ফল চাষ করিয়ে নিতে পারেন। মালিকেরও চাষের ঝক্কি পোহাতে হবে না, জমি একটুও খালি পড়ে থাকবে না, কিছু মানুষের কর্মসংস্থান হবে। এদের দিয়ে শহরে নগরে ছাদ বাগান করানো যায়। ছাদে

নিজের বাড়ির প্রয়োজনে অর্গানিক শাকসবজি চাষ হোক ঠিকা শ্রমিক রেখে। মাসিক গ্রাহক চাঁদার ভিত্তিতে নিকটস্থ গ্রামে সবজি চাষের জমি ভাড়া নেওয়া, তাতে আপন মর্জি মতো ফসল ফলিয়ে চাষ করিয়ে বাড়িতে জোগান পাওয়া সম্ভব। ধরা যাক এক কাঠা বা ৭২০ বর্গফুট এলাকা মাসিক দু'হাজার টাকায় ভাড়া নিলেন কেউ। চাষি ভাড়াটের মনমতো সবজি জৈবিক পদ্ধতিতে চাষ করবেন নিজে, ভাড়াটে নিজে দেখতেও আসতে পারেন, তার ভাড়া-জমি, নিজে হাতে ফসল তুলতে পারেন, শ্রমও দিতে পারেন। চাষি নিজের দায়িত্বে ভাড়াটিয়ার বাড়িতে শাকসবজি পৌঁছে দেবেন। একেবারে বিষমুক্ত খাবার।

দেশের মাটি, দেশের খাবার : চারিদিকে দেশি খাবারের দোকান হোক। 'দেশের মাটির দেশের খাবার'। Self help group শহরের বুকে বুকে এমন খাবারের রেস্টুরেন্ট বানাতে পারে। পাওয়া যাবে পান্তাভাতের সঙ্গে চিংড়ি মাছের ঝালচচ্চড়ি আর লঙ্কাপিয়াজ, মানকচু বাটা থেকে ধনেপাতা, খারকোল পাতা বাটা, গয়না বড়ি, মোচার ঘণ্ট, পটোলের দোরমা, ইলিশ ভাপা, রুই মাছের মুড়িঘণ্ট, ভেটকি পাতুরি থাকবে। থাকবে পায়েস, পিঠেপুলি, মালপোয়া, তালের বড়া, নারকেল নাড়ু। প্রয়োজনে বাড়ি বাড়ি সাপ্লাই হতে পারে। পরিচ্ছন্নতার সার্বিক বন্দোবস্ত নিয়ে করতে হবে। বিশুদ্ধ ও সাত্ত্বিক আহার, শরীরসম্মত আমিষ খাদ্য।

তাল খেজুরের নীরা, গুড়, পাটালিগুড় : শীতের মরশুমে কলকাতায় ৩০০ টাকা দিয়েও এক কেজি খাঁটি পাটালি গুড় পাওয়া যায় না। অথচ এর জন্য কী নেই? উদ্যোগ নেই। আছে শুধু ভেজাল। এই মার্কেটটা ধরতে হবে। রুখাশুখা এলাকায় রাশি রাশি খেজুর গাছ কী লাগানো যেতে পারে না? পতিত জমিতে ঘন করে, প্রয়োজনে আলের ধারে, পুকুর পাড়ে, খালের ধারে, গ্রাম্য রাস্তার ধারে ধারে খেজুর, তাল গাছ লাগানো হোক যত্ন নিয়ে। তাল খেজুর গাছ ঝাড়িয়ে রস নিষ্কাশন একটা লাভজনক গ্রামীণ শিল্প। খেজুর রসের নীরা, ঝোলাগুড়, পাটালিগুড়, তা থেকে হরেকরকমের খাবার। খাঁটি হওয়া চাই, নিখাদ পণ্য বিপণনের জন্য সুনামের সঙ্গে কাজ করতে হবে।

গো-আধারিত কৃষি শহরেও ঃ ভারতে গো-আধারিত জৈবিক কৃষি কাজ ফিরে আসুক। মানুষ সুস্থ হয়ে বাঁচুক। একটি প্রচলন কথা হলো— 'ধান ধন বড়ো ধন/আর ধন গাই/সোনা-রুপা কিছু কিছু/আর সব ছাই।' 'শ্যামলী আমার গাই/তুলনা তাহার নাই।' ছাদে কি শ্যামলী গাইয়ের ঠাঁই হবে? গো আমাদের মাতা যদি, তাহলে কেনই বা তাকে মাথায় করে রাখবো না! গ্রাম ক্রমাগত হয়ে যাচ্ছে শহর, শহর হয়ে যাচ্ছে নগর। ছেয়ে যাচ্ছে ছাদ, দেখা না যায় চাঁদ। অথচ ছাদ থেকেই তো মোহময়ী চাঁদ দেখবার কথা! ছাদে কুসমোদ্যান না থাকলে সে চাঁদের নান্দনিকতা কোথায়? ছাদের ব্যবহার কই? শহরাঞ্চলে ছাদ ব্যবহার করে একটি গোরু পালন করে পরিবারের চাহিদা মেটান। নিজের গাই ও বলদকে বাড়ির আপন সদস্য মনে করতে হবে। তার দেখভাল হবে স্বচ্ছতাকে সর্বোচ্চ বিবেচ্য বিষয় করেই; নিষ্কলুষ গোয়াল, ছবির মতো লেপা-পোছা। গ্রাম ছেড়ে যারা শহরে এসে পাকা বাড়ি করেছেন, তাতে হাজার দেড়েক স্কোয়ার ফুট খোলা ছাদও রয়েছে অনেকের। বৃষ্টির জল যেখানে লভ্য, তাকে সংরক্ষণ করে রাখার ব্যবস্থা করাও কঠিন নয়। সেখানে গো-মাতাকে কেন ছাদের চাদরে মাথায় করে ধরে রাখবো না? সিভিল ইঞ্জিনিয়ারকে দিয়ে বিশেষভাবে ছাদে মাটি ও জল ধরে রাখার ব্যবস্থা করে একজোড়া দুধেল গোরু পালন করুন। দুধের জন্য দু' এক জোড়া ছাগলও পোষা যায়, এমনকী রাখা যায় খাকি ক্যাম্বেল হাঁস ও ডিম দেওয়া মুরগির খাঁচা, জিওল মাঝের জলাধার খরগোশ পালনের ব্যবস্থা। এই সমুদয় কাজে যথাসম্ভব প্রকৃতির জল ব্যবহৃত হোক। বৃষ্টির জল ধরে তা শোধন করে কাজে লাগানো যাবে পালনশীল প্রাণীর স্নান, পরিচ্ছন্নতা ও তাদের পানীয় জলের চাহিদা মেটাতে। ল্যান্ডস্কেপ করে ছাদে এক ফুট মাটি ফেলার জন্য নির্মাণ প্রকৌশলীর সহায়তা নেওয়া হোক, সেখানে বারোবাস ঘন করে গোখাদ্য ও ঘরোয়া সবজি জৈব পদ্ধতিতে চাষ করে নেওয়া একেবারেই কঠিন কাজ নয়। কথায় বলে 'গাই গোরুর মুখে দুধ'। তাদের পরিবেশনের প্রয়োজনে ছাদেই চাষ করে নিন গোখাদ্য। গৃহস্থালী কাজের নানান বর্জ্য যেমন তরিতরকারির টাটকা খোসা, কলার খোসা, পুজোর ফুল, ভাতের ফেন ইত্যাদি পালিত গোরুকে খাওয়ান, প্রয়োজনে প্রতিবেশীর কাছ থেকে তা চেয়েও নিন। গোরব সার যথেচ্ছ ব্যবহার করুন ছাদের চাষে। ছাদেই তৈরি হোক ভার্মি কম্পোস্ট ইউনিট, তা বেচেও অধিক লাভ পাবেন গো-পালক। যতটা সম্ভব গোবর-গোমূত্র সংগ্রহ করার ব্যবস্থা থাকবে। গোমূত্র ধরে বঙ্গপ্রদেশের শহরাঞ্চলে, টবের গাছে জৈবকৃষির মূল্যবান তরল জৈব-সার হোক, তা লঘু করে গাছে সরাসরি স্প্রে করা চালু হোক। গোবর ব্যবহার ছাদে আয়োজিত ভার্মিকম্পোস্ট ইউনিটে, ছাদে প্রস্তুত মশা মারার ধূপ (জুড়িবুটি মিশিয়ে)। কাউ-ওয়াশ ব্যবহার হোক ছাদের কৃষিতে।

মানুষকেও বৈজ্ঞানিক তথ্য সহযোগে বোঝানো হোক নর্দমায় কিছুটা গোবর-গোমূত্র প্রবাহিত হলে নর্দমার নানান রোগজীবাণু ধ্বংস হয়। তা নিয়ন্ত্রণ মাত্রায় পরিবেশ বান্ধব। আর একটি কথা বলার তা হলো, ছাদে গো-পালন করলে ব্যবস্থা রাখা উচিত Soil water recharge করার। গোয়াল ধোয়া জল, বৃষ্টির উদ্বৃত্ত জলকে বিল্ডিংয়ের সন্নিকটে বিশেষ ব্যবস্থা করে (নুড়ি পাথর, বালি রেখে একটি আয়তাকার ক্ষেত্র নির্মাণ) জল মাটিতে প্রবেশ করানোর চেষ্টা। গোবর-জল মাটিতে গেলে তা বিশুদ্ধতর হবার সম্ভাবনা। একাজে ইচ্ছে থাকতে হবে। এটা একটা আন্দোলনের নাম হোক, 'শহর মাথে গো-মাতা'। শহর/নগরকে কেবলমাত্র লৌহ-লোষ্ট্র-পাথর খাঞ্চা না করে খাঁচা হোক জীবনের, সুবুজের। Operation Flood আসুক নেমে ছাদে। কেউ জুনোটিক রোগের দোহাই দিয়ে প্রস্তুত আন্দোলনকে ভাঙতে চাইলে তাদের বরং শহর নগরের সার্বিক রোগ-প্রতিকার আর রোগ-প্রতিরোধ আন্দোলনে শামিল হতে বলুন, সবুজের আন্দোলনে 'না' মানেই সভ্যতার পরাজয়। জল ধরুন, জল ভরুন, চাষ করুন, চাষ করান।

(লেখক বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিষিষ্ট প্রাবন্ধিক)

চিঠিপত্র

পড়াশোনায় করোনার থাবা

করোনার থাবায় তোলপাড় হয়ে গিয়েছে সারাবিশ্ব। অন্যান্য সব ক্ষেত্রের মতো শিক্ষা ব্যবস্থাতেও এসে পড়েছে তার ধাক্কা। যার প্রভাবে স্কুল পড়ুয়াদের মানসিক দৃষ্টিভঙ্গিকেই বদলে দিয়েছে। কিশোর বয়সি শিক্ষার্থীদের সবসময় কোনো না কোনো কাজে বা খেলাধুলায় ব্যস্ত রাখতে হয়। একটা প্রবাদ আছে 'অলস মস্তিষ্ক শয়তানের বাসা'। স্বাভাবিক সময়ে বিভিন্ন ভাবে তারা ব্যস্ত থাকলেও এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাদের মাথায় দুনিয়ার যত আজব চিন্তা ভর করাটাই স্বাভাবিক। দীর্ঘদিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকার কারণে অন্যান্যদের মতো খুদে পড়ুয়ারাও বিদ্যালয়ের আঙিনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাদের পড়াশোনা কার্যত শিকেয় উঠেছে। শিক্ষা দপ্তরের বিভিন্ন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাদের পড়াশোনার স্বাভাবিকভাবেই ঘাটতি আসতে বাধ্য। স্মার্টফোন, অনলাইন ক্লাস কখনোই বিদ্যালয়ের আঙিনায় পড়াশোনার সমতুল্য হতে পারে না। এছাড়াও ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক-শিক্ষিকা মেলবন্ধনের অভাবে স্বাভাবিকভাবেই মানসিক দূরত্ব গড়ে উঠছে।

যদিও বেসরকারি স্কুলগুলো আর্থিক লেনদেন থাকার কারণে অনলাইন ক্লাস চালু করেছে। তবে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতি চালু হয়নি। কিন্তু খুদে পড়ুয়াদের কাছে এটা সুস্থ মস্তিষ্ক গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। কিশোর বয়সেই স্মার্টফোন ব্যবহারের ফলস্বরূপ পরবর্তী সময়ে সুস্থ মানসিক বিকাশের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হতে পারে। এতদিন অনলাইনে পাঠ দেওয়া-নেওয়া অধরাই ছিল বেশিরভাগ শিক্ষক বা শিক্ষার্থীদের। কিন্তু ই-লার্নিংয়ের ফলে সকলকে এক ছাতার তলায় আনতে বাধ্য করল করোনা ভাইরাস। তবে অনেক দরিদ্র পরিবার ইন্টারনেট বা কম্পিউটারের বিষয়ে সড়গড় নয়। অনেকের আবার স্মার্টফোন কেনার সামর্থ্য নেই। কিন্তু কঠিন পরিস্থিতির জন্য কেন্দ্রীয় মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রক অনলাইন ক্লাসের জন্য নয়া ক্লাস মডেল তৈরি করছে। তবে এই ই-লার্নিংয়ের ব্যবস্থা সঠিক ভাবে রূপায়ণ করতে গেলে বড়ো রকমের সংস্কার আনতে হবে শিক্ষাব্যবস্থায়। এই পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ প্রশ্নচিহ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ থাকার কারণে প্রচলিত মূল্যায়ন হওয়া সম্ভব নয়। ফলে পড়ুয়াদের গুণগত উৎকর্ষতার মান নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় পরবর্তী শ্রেণীতে উন্নীত হলেও নির্দিষ্ট সিলেবাস শেষ করা যাবে না। ফলে পরবর্তী শ্রেণীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখা সমস্যা দেখা দেবে বলে মনে হয়। আবার মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিক পড়ুয়াদের স্বাভাবিক ভাবেই পড়াশোনায় ঘাটতি থেকে যায়। যদি আগামী বছর নির্দিষ্ট সময় অনুযায়ী এই পরীক্ষাগুলো হয়, তবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির অভাবে ফলাফলের নিরিখে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছানো সমস্যা দেখা দিতে পারে। এমতাবস্থায় এখনকার পড়ুয়াদের পঠনপাঠন নিয়ে সুস্থ সমাধানের পথ বের করা দরকার। শিক্ষাবর্ষ পিছিয়ে গেলেও শ্রেণী অনুযায়ী বয়সের তারতম্য দেখা দিতে পারে। কিন্তু বিকল্প পথও খোলা নেই। তাই করোনামুক্ত পরিবেশে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদ্যালয়ে পঠনপাঠন শুরু হবে ততই পড়ুয়াদের ক্ষেত্রে মঙ্গলজনক হবে।

—সমীর কুমার দাস,
দ্বারহাট্টা, হরিপাল, হুগলি।

অভিবাদনে বুকে হাত যুক্তিগ্রাহ্য

মানুষ মানুষকে সম্ভাষণ করে বিভিন্ন রীতিতে। সম্ভাষণ যেভাবেই হোক এটা যে করা শ্রেয়, তা সকল দেশের মানুষই অবগত। কেউ নমস্কার দেয়, কেউ মাথায় হাত উঠায়, কেউ করমর্দন করে, কেউ কেউ কোলাকুলি করে। কোলাকুলি একটি প্রাচীন রীতি সন্দেহ নেই। এটা হিন্দু অহিন্দু সবাই বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে অনুসরণ করে থাকে। এই রীতিতে এটাই আমরা বিশ্লেষণ করে পাই, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন। যেমন স্বামী স্ত্রীকে, প্রেমিক-প্রেমিকাকে, মা সন্তানকে, ভালোবাসার মানুষ তার প্রেমাস্পদকে এভাবেই আপন করে তোলে। এটাকে বলে হার্ট গ্রিটিং। আত্মার সঙ্গে আত্মার মিলন, অন্তরাত্মার সঙ্গে অন্তরাত্মার, পরমাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনই এর প্রধান লক্ষ্য। এ কোলাকুলির মধ্যে এমন একটা মাধুর্য বর্তমান সেটা ভাষায় প্রকাশ করা দুষ্কর। একে অনুভব করতে হয় হৃদয় দিয়ে। যখন মানুষের কোনো স্নেহের ধন হারিয়ে যায়, তার জন্য হৃদয়ে যে আকুলতার সৃষ্টি হয়, তাকে জড়িয়ে ধারার মাধ্যমে এর নিবৃত্তি হয়। সেটা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়া অনুমানযোগ্য নয়। কারণ ব্যতীত হৃদয়ের কাহিনি শুধু ব্যথিত হৃদয়কেই উদ্বেলিত করতে সক্ষম। অন্যে সেটা অনুভব করতেই পারে না। তাই বর্তমানে অনেক মুসলমান কান্ট্রির নেতা-নেত্রী এটা সহজেই অনুভব করতে সমর্থ হয়েছে, করোনার আবহে করমর্দন যখন নিষিদ্ধ তখন হৃদয়বৃত্তির সম্ভাষণকে মেনে নেওয়া যথেষ্ট আনন্দের। মানুষের হৃদয় বুকের বাঁ দিকে অবস্থিত। হৃদয়ের অনুভূতি পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বড়ো। টিভির পিকচার টিউবের মতো। পিকচার টিউবের সঙ্গে হার্টের সম্পর্ক যেন অবিচ্ছেদ্য। তাই বাইরের অনেক দেশই এখন স্বীকার করে নিচ্ছে, বুকে হাত দিয়ে সম্ভাষণ অপরকে হৃদয়ে মিশিয়ে নেওয়া। বুঝিয়ে দিচ্ছে তার হৃদয়ের অনুভূতিকে, অপরের হৃদয়কে নিজের স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ করে। এই রীতি সাধু বৈষ্ণবরাও করে থাকেন। তাঁরা বুকে হাত দিয়ে বুঝিয়ে দেয়, তুমি সত্যি আমার আপনার। তোমাকে ছাড়া এই পৃথিবী যে অর্থহীন । ভারতীয় উপমহাদেশে এই রীতি অনেকেই অনুসরণ করে। আমি তুর্কিদের এই রীতিকে সাধুবাদ জানাই।

—স্বপন কুমার ভৌমিক,
শান্তিপুর, নদীয়া।

খিঁচুড়ি, ইলিশ ও পেঁয়াজ নিয়ে জগাখিচুড়ি

রাজনীতি এখন ইলিশ, পিঁয়াজ ও খিচুড়ির মধ্যে আটকে গেছে। মনে হয় বাংলাদেশ নামক দেশের জনগণের এ মুহূর্তে এরচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আর কোনো সাবজেক্ট নেই? দুর্গাপূজা উপলক্ষ্যে বাংলাদেশ ১৪৭৫ টন মাছ দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে। ঠিক একই সময় ভারত হঠাৎ পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে দেয়। সামাজিক মাধ্যমে এজন্যে ভারতের চৌদ্দগোষ্ঠী উদ্ধার হচ্ছে।

বাংলাদেশ মাছ দিচ্ছে পশ্চিমবঙ্গকে, পূজার শুভেচ্ছা হিসেবে। এতে কূটনৈতিক বার্তা আছে, তবে বাঙ্গালি ব্যতীত বেশিরভাগ ভারতীয় মাছ খায় না, তাঁরা নিরামিষাশী। আবার বাংলাদেশে পিঁয়াজ আসে গুজরাট ও মহারাষ্ট্র থেকে, ওঁরা ইলিশ মাছ খায় না, তাই ইলিশ আর পেঁয়াজ তেমন কোনো সম্পর্ক নেই। ইলিশ নিয়ে পিঁয়াজ বন্ধ করার ষড়যন্ত্র তাই ঠিক জমছে না।

ইলিশ আর পেঁয়াজ দুটো এক হয়ে গেল কী করে তাও বোঝা যাচ্ছে না। ইলিশ পছন্দ শুধুমাত্র বাঙ্গালির আর পেঁয়াজ খায় পুরো বিশ্ব। আগে নাকি আমাদের দেশে সিলেটের পেঁয়াজে সয়লাব থাকতো, এখন ভারতের পেঁয়াজ বাজার দখল করে নিয়েছে। আচ্ছা, পেঁয়াজে স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়াটা কি খুব কঠিন? বাংলাদেশ-ভারত পেঁয়াজ চুক্তি আছে বলে শুনিনি। ব্যবসায়ীরা এলসির মাধ্যমে পেঁয়াজ আনে।

এবারও তাই আসছিল কিন্তু অভ্যন্তরীণ বাজারে চাহিদার তুলনায় স্বল্পতার জন্যে ভারত চালান আটকে দেয়। এতে আইনগত কোনো সমস্যা নেই। তবে ভারত এ ব্যাপারে আগেভাগে বাংলাদেশকে সতর্ক করতে পারতো। স্মর্তব্য যে, গত বছরও ভারত পেঁয়াজ রপ্তানি আটকে দিয়েছিল। যাইহোক, ব্যাপক হইচইয়ের পর জানা গেল, ভারত জরুরিভাবে বাংলাদেশকে তিনশো ট্রাক পেঁয়াজ দিচ্ছে।

ইলিশ বা পেঁয়াজ বিতর্কের মধ্যেই এলো খিচুড়ি। খবরে প্রকাশ, বাংলাদেশ এক হাজার সরকারি কর্মচারীকে খিচুড়ি রান্না শিখতে বিদেশ পাঠাচ্ছে। গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন বলেছেন, বিএনপি- জামাতপন্থী সাংবাদিকরা বিষয়টি উস্কে দিচ্ছে এবং এঁরা সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার অপচেষ্টা করছে। তার মতে এ নিয়ে হইচই করার কিছু নেই।

সমালোচনার মুখে 'খিচুড়ি' সংক্রান্ত বিদেশ ভ্রমণ বাতিল হয়েছে। তবে সবাই মানবেন, খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ মাছ ভাজা বা ইলিশের পেঁয়াজের কোনো তুলনা হয় না! তাই হয়তো ইলিশ-পেঁয়াজ ও খিচুড়ির মধ্যে একটা চৎমকার সম্পর্ক বিদ্যমান! এছাড়া বাংলাদেশের ইলিশ ও জামদানির গুণ বহুবিধ। এ দুটো কলকাতার বাঙ্গালি বাবুদের মুখ দীর্ঘদিন বন্ধ করে রেখেছিল। এ তালিকায় এমনকী নোবেল বিজয়ীও আছেন।

সামাজিক মাধ্যমে দেখলাম, 'ইলিশের প্যাকেটে পুটিমাছ' পাওয়া গেছে। হয়তো ভারতের সমালোচনার জবাবে এটি প্রোপাগান্ডা। এজন্যে হিন্দুরা 'ভারতের দালাল' বলে গালি খাচ্ছে। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আবদুল মোমেন বলেছেন, হঠাৎ পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করায় ভারতের বিদেশ দপ্তর দুঃখ প্রকাশ করেছে। আসলেই খিচুড়ি, ইলিশ ও পেঁয়াজ নিয়ে জগাখিচুড়ি অবস্থা।

—শিতাংশু গুহ,
নিউইয়র্ক।

ভারতবর্ষকে শেষ করে দেওয়ার চক্রান্ত

গত ৪ জুলাই ২০২০, স্বস্তিকায় প্রকাশিত ডাঃ আর এন দাসের লেখাটা পড়েছি। খুবই সময়োপযোগী। আমরা ভারতবাসীরা নিজেদের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ নই বলে যুগ যুগ ধরে বিদেশিরা আমাদের দেশ আক্রমণ করতে সুযোগ পেয়েছে। ভারতবর্ষকে আক্রমণ করেই তারা যে ক্ষান্ত ছিল তা নয়, তারা ভারতবর্ষের ধর্মের উপরও আঘাত হেনেছে। তাদের অনুসারীরা এখনোও সেই কাজই করে চলেছে।

আমার স্বল্প বুদ্ধিতে মনে হয়েছে পৃথিবীতে যে কটা ধর্মমত আছে তার মধ্যে উচ্ছৃঙ্খল হলো ইসলাম । এই ধর্মকে উচ্ছৃঙ্খল বললেই থেমে গেলে ঠিক বলা হবে না, এটি বর্বর ও নৃশংস বললেও কম বলা হবে।

এই মতাবলম্বী মানুষগুলি সারা বিশ্বকে অস্থির করে তুলেছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, আমাদের ভারতবর্ষের বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-নেত্রী ও সমর্থকরা সব জেনেও এই মতাবলম্বী মানুষগুলিকে ভোটব্যাঙ্কের স্বার্থে সমর্থন করছে। এই ভাবে চলতে থাকলে আর বেশিদিন লাগবে না ভারতবর্ষকে শেষ করে দিতে। ইদানীং আল-কায়দার যেসব জঙ্গি ধরা পড়েছে তাদের পক্ষে কেউ কেউ চোখের জল ফেলছে। দলমত নির্বিশেষে এদের বিরুদ্ধে এখনই সোচ্চার হতে হবে।

—মনু মণ্ডল,
বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৭০।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন তাঁর রাজ্যের কৃষকদের প্রধানমন্ত্রী কৃষক সম্মান নিধি যোজনা ও আয়ুষ্মান ভারত প্রয়োগ করতে অনুমতি দিতে পারেন যদি সেই টাকা রাজ্য সরকার মারফত দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর কথাবার্তা শুনে আশ্চর্য লাগছে। তৃণমূলের নেতাদের আমফানের টাকা চুরির ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রী নিজে ঘোষণা করেছেন যারা আমফানের টাকা চুরি করেছে তাদের ফেরত দিতে হবে। আবাস যোজনার টাকায় কাটমানি নেওয়াতেও দিদির ভাইয়েরা জড়িত। এরপর কী করে বিশ্বাস করা যায় রাজ্যের মারফত কৃষক সম্মান নিধির টাকা দেওয়া হলে সম্পূর্ণ টাকা কৃষকরা পাবেন? দিদির কৃষক দরদ টরদ কিছু নয়, কাটমানি পাবেন না তাই কৃষকদের বঞ্চিত করছেন। আয়ুষ্মান ভারত থেকে রাজ্যবাসীকে বঞ্চিত করার কারণও সেটাই।

—কমল মুখার্জী,
চুঁচুড়া, হুগলী

অঙ্গনা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে মাতৃশক্তি মাতঙ্গিনী হাজরা

অস্মিতা চক্রবর্তী

১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বোম্বাই অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধী ভারতছাড়ো আন্দোলনের ডাক দেন। উদ্দেশ্য ছিল ইংরেজকে ভারত থেকে সরিয়ে দেওয়া। স্লোগান ছিল, 'ইংরেজ, ভারতকো ছোড়ো' ও 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে'। ডু অর ডাই। আসমুদ্র হিমাচলের সমস্ত ভারতবাসী প্রায় দু'শো বছরের পরাধীনতার ক্ষোভে আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদান করেন। এবার আর কোনো আপোশ নয়। সরাসরি ইংরেজদের ভারত ছাড়া করার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ়সংকল্প সমস্ত ভারতীয়। অহিংস ও সহিংস— দুই পথেই চলল সংগ্রাম। অর্থাৎ আমৃত্যু স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হলো সর্বভারতীয় স্তরে।

ইংরেজকে ভারত ছাড়তে বাধ্য করার যে ডাক গান্ধীজী দিলেন তা বঙ্গপ্রদেশে এসে পৌঁছালো। বঙ্গের মহিলাদের মধ্যে গান্ধীজীর ডাকে যাঁরা সাড়া দিলেন তাঁদের অন্যতম হলেন বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরা। বর্তমান পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক মহকুমার

হোগলা গ্রামে তাঁর জন্ম ১৮৬৯ সালে। কেউ কেউ বলেন ১৮৭০ সালের ১৯ অক্টোবর তাঁর জন্ম। দরিদ্র কৃষক পরিবারের এই নারী প্রথাগত কোনো শিক্ষা পাননি।

ত্রিলোচন হাজরার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয় বাল্যকালে। কোনো সন্তানসন্ততি ছিল না, মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি বিধবা হন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের সময়ে মাতঙ্গিনী হাজরা সক্রিয়ভাবে স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। তিনি ছিলেন গান্ধীবাদী। এজন্য স্থানীয় মানুষ তাঁকে সম্মান দিয়ে 'গান্ধীবুড়ি' বলে ডাকতেন। ১৯৩২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে তিনি যোগদান করেন। লবণ আইন ভঙ্গ করে ব্রিটিশের দ্বারা কারারুদ্ধ হন। মুক্তিলাভের পরেও লবণ-কর বন্ধ করার জন্য তিনি প্রতিবাদ আন্দোলন চালিয়ে যান। ফলে ব্রিটিশরা তাঁকে আবার গ্রেপ্তার করে এবং ছ'মাসের জন্য বহরমপুর কারাগারে প্রেরণ করে। কারামুক্তির পর সক্রিয়ভাবে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সদস্যপদ গ্রহণ করেন। তিনি নিজের হাতে চরকা কাটতে শুরু করেন। ১৯৩৩ সালে কংগ্রেসের আঞ্চলিক সম্মেলন হয় শ্রীরামপুরে। এখানে মাতঙ্গিনী হাজরা অংশগ্রহণ করেন। শেষে ব্রিটিশ পুলিশ লাঠিচার্জ করে, মাতঙ্গিনী হাজরা গুরুতরভাবে আহত হন।

বেয়াল্লিশের ভারত ছাড়ো আন্দোলনে জাতীয় কংগ্রেস বিভিন্ন আঞ্চলিক থানাগুলি অধিগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। ৭২ বছর বয়সের গান্ধীবুড়ি আবার ঝাঁপিয়ে পড়েন স্বাধীনতার আন্দোলনে। প্রায় ছয় হাজার বিপ্লবী তাঁর নেতৃত্বে একটি মিছিল করে, উদ্দেশ্য তমলুক থানা দখল। শহরের প্রান্তে যখন বিশাল মিছিল এসে পৌঁছায় ১৪৪ ধারা অনুসারে ব্রিটিশ পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ হতে বলে। বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী এগিয়ে চলেন সদর্পে। আবেদন করেন জনগণকে গুলি না চালাতে, তখনই প্রথম গুলি এসে আঘাত করে তাঁকে। তাতেও পিছিয়ে যাননি মাতঙ্গিনী। 'বিপ্লবী' সংবাদপত্রের খবর অনুসারে, সমান্তরাল তমলুক জাতীয় সরকারের বক্তব্য ছিল— মাতঙ্গিনী ক্রিমিনাল কোর্ট বিল্ডিংয়ের উত্তরদিক থেকে মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। প্রথম গুলি চলার পরেও, তিরঙ্গা পতাকা হাতে নিয়ে তিনি সকল বিপ্লবীকে পেছনে

ফেলে সামনে এগিয়ে যান। ব্রিটিশ পুলিশের দিক থেকে তিনবার গুলি চালানো হয়। তবুও তিনি এগিয়ে যেতে থাকেন। কপালে ক্ষত, দুই হাতে ক্ষত তথাপি তেরঙ্গা পতাকা এতটুকু ঝুঁকে যায়নি। শেষ বারের মতো ‘বন্দে মাতরম্’ ধ্বনি দিতে দিতে পতাকা উঁচু রেখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে প্রাণত্যাগ করেন ।

মনে পড়ে ১৯১৯ সালের কথা। নিষ্পাপ নিরপরাধী কতকগুলি মানুষের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে নির্বিচারে গুলি চালায় ব্রিটিশ পুলিশ- বাহিনী। নিঃশেষে শেষ হয়ে যায় ভারতীয় মানুষগুলি। ঘটনাটি কুখ্যাত হয়ে আছে জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড রূপে। গত বছর এই ঘটনার শতবর্ষ পূর্তি ছিল, আমরা বেদনার্ত চিত্তে স্মৃতিচারণ করেছি। মাতঙ্গিনী হাজরাকেও ১৯৪২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর নিঃশেষে শেষ করে দেওয়া হয় একের পর এক গুলি চালিয়ে। অত্যাচারী পরদেশগ্রাসী গোষ্ঠীরা এমনি হয়— নৃশংস নির্দয়।

আজ একবিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে, বিশ্বায়নের পৃথিবীতে আধুনিক মানুষ দাবি করেন রাষ্ট্রহীনতার। মনে হয়, এই মানুষগুলোর স্বদেশপ্রেম কি কোনো আবেদনই রাখে না তাদের চিত্তে? শুধু দশের জন্য, দেশের জন্য আত্মবলিদানের এই সত্য ইতিহাসগুলি কি একদিন স্বার্থান্বেষী আধুনিক মানুষের কাছে গল্প কাহিনি বলে মনে হবে? বঙ্গের প্রতিটি শিশু কি শ্রদ্ধা করতে শিখবে বীরাঙ্গনা মাতঙ্গিনী হাজরাকে? যদি এই শ্রদ্ধাবোধ আমাদের মধ্যে না গড়ে ওঠে তাহলে বলব, ভারতবাসী এই ঐশী পূর্বপ্রজন্ম পাওয়ার যোগ্যতা হারিয়েছে। আশাবাদী হতে ইচ্ছা করে। তাই বলি, সারা ভারত মাতঙ্গিনী হাজরার মতো বীরাঙ্গনা নারীকে কখনো ভুলবে না, ভুলতে পারে না।

বিশেষ আবেদন

বর্তমান করোনা মহামারীর ভয়াবহ পরিস্থিতিতে স্বস্তিকা মুদ্রিত আকারে প্রকাশ করা সম্ভব হচ্ছে না। www.eswastika.com এতে ইন্টারনেট সংস্করণ নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।

স্বস্তিকার সকল প্রচার প্রতিনিধি, পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের প্রতি বিশেষ আবেদন, আপনারা স্বস্তিকার ইন্টারনেট সংস্করণটি আপনার পরিচিতদের মধ্যে হোয়াটস্অ্যাপ বা ই-মেলের মাধ্যমে পৌঁছে দিয়ে স্বস্তিকার প্রচারে আমাদের সহযোগিতা করুন। —*ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা*

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,
৮৬৯৭৭৩৫২১৫,
হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**
IFSC Code : **UTIB0000005**
Bank Name :
AXIS Bank Ltd.
Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

সানরাইজ®

শাহী
গরম
মশলা

SUNRISE PURE

রান্নায় আলাদা মাত্রা এনে দেয়

মাতৃশক্তি

মিতালী মুখার্জী

'ছায়ার ঘোমটা মুখে টানি/আছে আমাদের পাড়াখানি'। না, দিঘি তার মাঝখানটিতে নেই। কিন্তু ছায়াঘেরা শান্ত নিরিবিলি শহরতলির এই ছোট্ট গ্রামখানির নিস্তরঙ্গ জীবনে সবাই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তারই মধ্যে এক সকালে আলোড়ন উঠল এই গ্রামের মানুষের মধ্যে।

পুজোমণ্ডপের বাইরে বাঁধানো বকুলগাছটির বেদিতে ঘুমিয়ে আছে একটি মেয়ে। হ্যাঁ, জলজ্যান্ত একটি যুবতী মেয়ে। শীর্ণ শরীর। অবিন্যস্ত বেশবাস। গভীর আয়ত দুটি চোখ আর আর শ্যামলা গায়ের রং। কে তাকে প্রথম আবিষ্কার করল তাই নিয়েই কেটে গেল সারাটা সকাল। 'সেই বার্তা রটে' যেতে সময় লাগলো না। দলে দলে সব দেখতে এল তাকে। তারপর এল গ্রামের মুরুব্বিরা। তারও পর এল মহিলারা। ছোটোদের দল তো এমন উপহার ভাবতেই পারে না। তারা পালা করে ঘিরে রইল সারাদিন।

কে, কোথা থেকে এসেছে, কী মতলব, এখানেই-বা কেন? নাম কী? চোর, জোচ্চোর, স্পাই, এমনকী ছেলেধরা এরকম যতকিছু ভাবা যায় বা প্রশ্ন তোলা যায় সব হয়ে গেল। কিন্তু যাকে নিয়ে এত প্রশ্ন সে একেবারে নীরব। লোকজনের চিৎকারে ঘুম ভেঙ্গে উঠে থেকে সে একই জায়গায় বেদির ওপর চুপ করে বসে। কোনো প্রশ্নের উত্তর নেই। শুধু বড়ো বড়ো দুটি চোখে নীরব মিনতী।

এক সময় সবাই মিলে কতগুলি জিনিস আবিষ্কার করল। মেয়েটি কানে শোনে না, কথাও বলতে পারে না। তখন ঠিক হলো থানায় খবর দেওয়া হোক। এই সব জল্পনা কল্পনায় দুপুর গড়িয়ে গেল। মেয়েটি সে সকাল থেকে ঠাঁয় একভাবে বসে। মাঝে মাঝে করুণ দৃষ্টিতে সবার দিকে তাকানো ছাড়া আর কিছু তার দিক থেকে সাড়া পাওয়া গেল না। এমন সময় বড়োবাড়ির চাকর মোহন এসে এসে জানালো বড়োমা আসছেন। বড়োমার বয়স কত বা কার বড়োমা এসব কথা কেউ জানতে চায় না। বড়োমার কথা এগাঁয়ের সবাই বেদবাক্য বলেই মেনে নেয়।

সবাই উৎসুক হয়ে রইল বড়োমা এসে কী বলবেন তার জন্য। বড়োমা এলেন, দেখলেন। তাঁর দুচোখ ছল ছল করে উঠল, ভিড়ের দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার স্বরে বললেন, 'মেয়েটি সকাল থেকে না খেয়ে বসে রয়েছে, কেউ খাবার দাওনি? তোমরা মানুষ!

অনেক কিছু বলার থাকলেও কেউ কিছু বলল না। বড়োমার ওপর কথা বলা যায় না। খুব শান্তভাবে মেয়েটির মাথায় হাত রাখলেন তিনি। ভিড় কমতে শুরু করেছে। বড়োমার হাত যার মাথায় তার আর চিন্তা নেই। মেয়েটির হাত ধরে টানতেই পিছন পিছন চলল। সে রাতের মতো বড়োমা সিঁড়ির তলার ঘরটি পরিষ্কার করিয়ে তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। দু'চার দিন কাটল, এর মধ্যেই মেয়েটি বড়োমার বেশ ন্যাওটা হয়ে উঠেছে। বড়োমা একদিন পাড়ার মুরুব্বিদের ডেকে পাঠালেন। পুলিশে একটা খবর লিখিয়ে আসতে বলে নিজেই মেয়েটির ছবি দিয়ে খবরের কাগজে দেবার ব্যবস্থা করলেন। ধীরে ধীরে গ্রামের সকলে অভ্যস্ত হয়ে পড়লো ওর উপস্থিতির। কাজলকালো চোখ বলে বড়োমা নাম দিয়েছেন কাজল। বাচ্চারা ওকে বড়ো ভালোবাসে। কাজলাদিদি ছাড়া ওদের খেলা জমে না। বউ-মেয়েদের কাজল ছাড়া আলপনা দেওয়া হয় না। মেয়েটাও তেমনি, হাতের কাজ কেড়ে নিয়ে করে দেয়। ছায়ার মতো

পায়ে পায়ে ঘোরে আর মাঝে মাঝে পড়ন্ত বিকেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে কী যে ভাবে কে জানে। কেউ কখনো ওকে কাঁদতে বা হাসতে দেখেনি।

দেখতে দেখতে গ্রামেরই একজন হয়ে উঠল কাজল। এমন বিনে পয়সার বাধ্য 'কাজের লোক' পেয়ে টানাটানি পড়ে গেল ওকে নিয়ে। এর মধ্যেই একদিন বিনা নোটিশে বিনা অসুখে বড়োমা চলে গেলেন। তাঁর যাবার বয়স হয়েছিল। কিন্তু সমস্যা হলো কাজলকে নিয়ে। সে একদম পাথর হয়ে গেল। বাড়ির লোকেরাও ওকে আর বাড়িতে রাখতে ভরসা পেল না। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েও কোনো ফল হয়নি। গ্রামের সহৃদয় এক ব্যক্তি একটা পুরনো সেলাই মেশিন দিলেন কাজলকে। পাড়ার ক্লাব থেকে মণ্ডপের পাশেই একটা মাথা গোঁজার ঠাঁই করে দিল কাজলকে। রোজ সে ক্লাবে ঝাঁট দেয় আর টুকিটাকি কাজ করে দেয়। পাশে বানানো চাঁচের বেড়া আর লোকের অব্যবহার্য টিনের কুটির। সেখানেই এক কোনে কারো দেওয়া পুরনো স্টোভ আর কিছু বাসনে তার সংসার। কোনো অভিযোগ নেই কাজলের। ওর স্বভাবের জন্য সবাই এই নির্ঝঞ্ঝাট মেয়েটিক স্নেহের চোখে দেখে। পাড়ার দর্জি তাকে কিছু সেলাই করতে দিলে খুব যত্ন করে সেলাই করে দেয়। পাড়ার বউদিদের হাত থেকে নিয়ে তরকারি কোটা, বাসন মাজা, আলপনা দেওয়া, এমনকী ঘর সাজাতেও সে সিদ্ধহস্ত। পাড়ার বাচ্চাদের খেলায় সে কানামাছি। দেখতে দেখতে এই গ্রামেরই একজন হয়ে উঠল কাজল। হাতে হাতে কাজ করে দেবার বদলে সবাই তাকে খাবার বা এটা-ওটা দেয়। এভাবেই লোকের পেলে দেওয়া অযত্নের জিনিসে সেজে উঠল তার যত্নের সংসার।

বেশ চলছিল এভাবে। কাজলের এই গ্রামে আসা প্রায় মাসকয়েক হয়ে গেছে। হঠাৎ একদিন সকালে আবার হইহই। বাঁধানো বকুলতলায় কাজল পড়ে আছে। অবিন্যস্ত চুল, অসংযত বেশবাস। অবিরল ধারায় বয়ে চলেছে তার চোখের জল। আবার দলে দলে দর্শক। জল্পনা, কল্পনা, সন্দেহ। হতভাগী তো বলতেও পারে না কে তার এমন সর্বনাশ করল। বড়োরা একটু গম্ভীর হলো। মেয়েমহলে ফিসফাস উঠল। বাচ্চাদের কিছুদিন তারা আটকে রাখলো। কাজলকে কেউ আর তেমন ডাকে না। সবার চোখে-মুখে একটা চাপা উত্তেজনা।

কিন্তু সময় কথা বলে। কাজলের শরীরে মাতৃত্বের লক্ষণ ফুটে উঠেছে। যা সন্দেহ ছিল তা সত্য প্রমাণিত হলো। কাজল আগের মতো আর এবাড়ি ওবাড়ি গিয়ে বউদিদের পায়ে পায়ে ঘোরে না। তবু হাতের কাজ ভালো বলে কিছু কাজ জুটেই যায়। কেউ-বা দয়া করে কিছু খাবার তাকে দেয়। এদিকে দিনে দিনে বাড়তে থাকলো তার গর্ভের সন্তান। শান্ত কাজল আরও শান্ত ও উদাস হয়ে পড়লো।

সামনে পুজো। পাড়ার মেয়ে-বউদের এখন কাজলকে খুব দরকার। পাড় বসানো, ঘর সাজানো, আরও অনেক কাজ। বাচ্চাদের কাজলের দায়িত্বে রেখে নিশ্চিন্তে চলে যাওয়া শপিং মলে। শীর্ণ কাজল আরও শীর্ণ হতে থাকলো। শুধু বাড়তে থাকলো তার গর্ভ। তার দিঘির মতো চোখের তলায় কালি। খেয়েছে কিনা, শরীর কেমন আছে, তাতে কারো দরকার নেই। সে যেন পড়ে পাওয়া চোদ্দআনা। যার যখন দরকার কাজে লাগালেই হলো। বড়োমা-ও নেই। কে বলবেন তোরা মানুষ! এভাবেই চলছিল আর ওর শরীরে বেড়ে উঠছিল আর একটি অনাকঙ্ক্ষিত প্রাণ। সকলের অবজ্ঞা আর বিরক্তি নিয়ে তাদেরই প্রয়োজন মেটাতে কাজলের দিন কেটে যাচ্ছিল। বড়োমা থাকলে হয়তো অন্যরকম হতো। কিন্তু গ্রামবাসীরা এই উড়ে এসে জুড়ে বসা আপদকে ফেলতেও পারছে না, গ্রহণ করতেও পারছে না। মাঝে মাঝে কাজলকে দেখা যায় বসে বসে অস্তমান সূর্যের দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে। তার দুচোখের জলের ধারা তারই বুকে শুকিয়ে যায়। আজকাল কারো বাড়ি থেকে ছেঁড়া চাদর বা পুরনো শাড়ি পেলে তা দিয়ে পরম যত্নে কাঁথা বানায়। আসন্ন মাতৃত্বে তার ক্লান্ত চেহারাতেও কেমন একটা মমতা আর মিষ্টত্বের ছোঁয়া লেগে কাজলকে আরও অসহায় করে রাখে।

দিন কাটছিল এভাবেই। কাজলের শরীরে এখন পূর্ণ মাতৃত্বের লক্ষণ। ফিসফাস হতে থাকে মেয়েমহলে। রাতবিরেতে কিছু হলে কী হবে, তারপর কে দেখবে তাকে। সকলেই ঝমেলামুক্ত হবার ঘোষণা করে অন্যের দিকে উত্তর খোঁজে।

ক্লাবের ঠাকুরের কাল ভোরে হবে চক্ষু দান। কাজলের আজকাল কাজ বেড়ে গেছে বেশি। ক্লাবে ঠাকুর তৈরির কাজ ও স্বেচ্ছায় করে দেয়। পাড়ার কেউ ডাকলে এই শরীরেও অতি যত্নে সব করে আসে। আর দিন শেষে ক্লান্ত দেহে ভরা শরীরে আশ্রয় নেয় তার ছোট্টো ঘরটিতে।

সেদিনও তার অন্যথা হয়নি। কিন্তু মাঝরাতে এক আর্তচিৎকারে চমকে উঠলো আশেপাশের বাড়ির লোকজন। ভয়ংকর এক আর্তচিৎকার ভেসে আসছে ক্লাবের দিক থেকে। বিছানা ছেড়ে বড়োরা দৌড়াল ক্লাবের দিকে। সবাই দেখল কাজলের ঘরের সামনে রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে একটি লোক আর কাজল দেবী চণ্ডিকার মতো রক্তমাখা বটি হাতে লোকটির পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে। কাজলের বেশবাস অসংযত। তার আসন্ন মাতৃজঠর প্রায় অনাবৃত। শিশির ধোয়া রাতেও কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সর্বক্ষণের অযত্নের এলোখোঁপা ছড়িয়ে গিয়েছে পিঠময়। খোলা স্তনদুটি মাতৃরসে পরিপূর্ণ। দুটি চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে আগুন। ঠোঁটের কোনায় আত্মবিশ্বাসের আভাস। মুখে অদ্ভুত এক আলোর দীপ্তি। এই দীপ্তি মাতৃত্বের, এই দীপ্তি সততার। তার এই অসুর বিনাশিনী রূপ দেখে মাথা নত করল সবাই। তার হুঁশ নেই বেশবাস বা নিজের অস্তিত্বের দিকে। বোবা কালা কাজল একদিন নিজেকে রক্ষা করতে না পারলেও আজ গর্ভস্থ সন্তানের রক্ষার জন্য হাতে তুলে নিয়েছে অস্ত্র, প্রয়োগ করেছে যথাযথ। সে এখন মূর্তিময়ী কালিকা। আজ কেউ আর কাজলের দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকালো না। সবাই মনে মনে প্রণাম জানালো এই আলোকময়ী শক্তিরূপিনী মাতৃমূর্তিকে।

হঠাৎই একটু দূরে বেজে উঠল শঙ্খ। তারপরই বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের কণ্ঠে দেবী চণ্ডিকার স্তব ঃ

যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নম নমঃ।।
যা দেবী সর্বভূতেষু শক্তিরূপেন সংস্থিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নম নমঃ।।

ঘটনার আকস্মিকতায় সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তারপরই খেয়াল হলো আজ তো মহালয়া। এরই মধ্যে দুজন মহিলা এগিয়ে এসে ঘরে নিয়ে গেল কাজলকে। একটা ছেঁড়া চাদর জড়িয়ে দিল গায়ে। বড়োবাড়ির রজতদা গম্ভীরস্বরে বললেন, 'কেউ থানায় খবর দিয়ে এস।' বেলা বাড়লে থানা থেকে লাশ নিয়ে গেল। জানা গেল পাশের গ্রামের আলু ব্যবসায়ী। এপাড়ায় যাওয়া-আসা সূত্রে কাজলের অসহায়তার সুযোগে সে-ই অপকর্মটি করে। আজ তাকে উচিত শিক্ষা দিয়েছে কাজল। থানায় নিয়ে গেল কাজলকেও।

কাজল এখন হোমে। সেখানে সে একটি কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে। হোম থেকে নাম রাখা হয়েছে দুর্গা। ■

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার
যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩

SURYA
Energising Lifestyles
Innovative
DESIGN
World-Class Quality
PRODUCTS
Just One Name
SURYA
lighting
fans
appliances
pipes
SURYA ROSHNI LIMITED
E-mail: consumercare@sroshni.com I www.surya.co.in
Tel.: +91-11-47108000, 25810093-96
Toll Free No.: 1800 102 5657
/suryalighting I /surya_roshni